KUinEu
Khulna UniversityGraduate in Europe

www.kuin.eu

শেকড়ের টানে
For the Roots

INTERNATIONAL
MOTHER LANGUAGE DAY

আন্তর্জাতিক
মাতৃভাষা দিবস

সূচিপত্র

- আমাদের কথা
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
- Interrelationship between German and English language
- বলতে না পারা কথা
- হাঙ্গেরিতে প্রথম দিন
- স ম য়
- বন্ধু
- সখী, ভালবাসা কারে কয়?
- The Streets and Architecture of Bucharest: A Photo Diary of Perfect Mixture
- এইটুকু ফাঁক থাকা ভালো
- জার্মানিতে বরিশালের ঐতিহ্যবাহী পানীয় "মলিদা"
- তুই আমার আরেক মেয়ে
- শহুরে সবুজ বাসে জীবনের প্রতিচ্ছবি
- কানাইনগর
- স্বপ্নভঙ্গের টুকরো স্মৃতি
- মানুষ
- Covid-19 ব্যবস্থাপনা, ভাবতে হবে নতুন করে
- এক সুপ্ত লালিত স্বপ্নের পথ চলা শুরু...
- KUinEu reunion 2021

প্রচ্ছদ অঙ্কন, পরিকল্পনা এবং সম্পাদনায়

তৌহিদ আমানুল্লাহ, স্থাপত্য'৯১/স্টকহোম, সুইডেন
বিশ্বজিৎ মল্লিক (শুভ), নগ্রাপ'৯৪/ড্রেসডেন, জার্মানি
মোঃ খুরশীদ হাসান সজীব, নগ্রাপ' ৯৯/ বন, জার্মানি
শাহী মোঃ তানভীর আলম, অর্থনীতি'০১/স্যাগেড, হাঙ্গেরি
জামিল শুভ, বিজিই'১৪/বন, জার্মানি
এম এম আব্দুল্লাহ আল মামুন সনি, সমাজবিজ্ঞান'১৪/দেব্রেসান, হাঙ্গেরি

স্বত্বাধিকারী

KUinEu

©blog.10minuteschool.com

আমাদের কথা

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী লগ্নে ইউরোপে বসবাসরত খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীগণের পক্ষ হতে সকল ভাষা শহীদের প্রতি রইল অন্তরের অন্তস্থল হলে শ্রদ্ধা ও পুষ্পার্ঘ্য। বাংলা আমাদের মায়ের ভাষা-সুদূর প্রবাস জীবনে ব্যস্ত দিনে ক্লান্ত শরীরে বারবার ফিরে যেতে মন চায় অস্তিত্বের তরে। সেই ফিরে যাবার প্রয়াস হতেই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে 'শেকড়ের টানে' এর দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশের এ উদ্যোগ।

এ সংখ্যার প্রতিপাদ্য বিষয় ভাষা আন্দোলনের পটভূমি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, যা আমাদের নতুন প্রজন্ম তাদের লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরেছে এবং যা ভবিষ্যতে দেশ ও মাতৃভাষার প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা এবং অকৃত্রিম ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ।

বিদেশ জীবনের সাফল্য ও ব্যর্থতার ইতিগাঁথার মাঝে দেশ মাতৃকায় ফেলে আসা স্বর্ণালী দিনলিপির স্মৃতিচারণা যারা এ সংখ্যায় তুলে ধরেছেন, তাঁরা কেউ কবি নন, নন কোনো প্রথিতযশা সাহিত্যিক।

স্মৃতি ও অনুভূতির আলতো স্পর্শে রচিত কিছু সংকলন নিয়ে এ দ্বিতীয় সংখ্যা নিতান্তই ব্যক্তি জীবনের না বলা কথার প্রতিচ্ছবি।

তবুও তাঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং কুন্ঠাহীন অংশগ্রহণে "শেকড়ের টান"-এর মাতৃভাষা সংখ্যা আমাদেরকে আবার প্রভাত ফেরীর কথা মনে করিয়ে দেয়। অজান্তে দুঃখ ভারাক্রান্ত কন্ঠে গেয়ে উঠি, "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি.." - সত্যিই প্রতিটি বাঙালীর ধমণীতে বহমান এক উদ্দীপনা যার অস্তিত্ব চিরঅম্লান, আব্দুল গফ্ফার চৌধুরী'র অমর পংক্তিতে ও শহীদ আলতাফ মাহমুদ এর হৃদয়গ্রাহী সুরে।

মনে পড়ে যায় আব্দুল লতিফ এর 'ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়....' কি অদ্ভুত চেতনার নিগূঢ় পংক্তি, যা আজো শিহরণ জাগায়।

আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াসে অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি মার্জনীয়।

সকল ভাষা সৈনিকের প্রতি আমাদের এই আয়োজন উৎসর্গকৃত।

ধন্যবাদান্তে/
সম্পাদকমন্ডলী

ছবিঃ নিসা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

শাহী মো: মেহরাব আলম

সভ্যতার সূচনা লগ্ন থেকে মানুষ নিজের ভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছে। কখনো সে অঙ্গভঙ্গি করেছে, কখনো বা ছবি এঁকেছে, আবার কখনো মুখ থেকে নানান রকম আওয়াজ করেছে। যুগ যুগ ধরে মনের ভাব প্রকাশের জন্য মানুষের মুখনিঃসৃত এই বিভিন্ন ধরনের বিক্ষিপ্ত আওয়াজের সমষ্টিগত সংগঠিত পূর্ণাঙ্গ রূপ হল ভাষা। সেই নির্দিষ্ট ভাষাটির সাথে জড়িয়ে থাকতে পারে ইতিহাসের ঐতিহ্য, ঐতিহাসিক সংস্কৃতি তথা মহান আবেগ। মনের অন্তঃস্থলে লুকিয়ে থাকা ভাবকে ছুঁয়ে প্রকাশ করে যে ভাষা, তার সাথে যে আবেগ জড়িয়ে থাকবে, তা বলাই বাহুল্য। মানুষের সেই আবেগকে, প্রত্যেকের মাতৃভাষার সাথে জড়িয়ে থাকা ইতিহাস তথা মহান সংস্কৃতিকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানানোর উদ্দেশ্যে প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারি বিশ্বজুড়ে পালিত হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

মাতৃভাষা কীঃ

মানুষের জীবনে মাতৃভাষার গুরুত্ব অপরিমেয়। সাধারণ অর্থে মাতৃভাষা বলতে আক্ষরিক অর্থে মায়ের ভাষাই বোঝায়। একটি বৃহত্তর অঞ্চলে একই সাথে বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত থাকে। এর মধ্যে বেশিরভাগ মানুষ যে ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করে, সেটাই হচ্ছে সে অঞ্চলের মানুষের মাতৃভাষা। মাতৃভাষা মায়ের মুখের আঞ্চলিক বুলি মাত্র নয়, মাতৃভাষা হচ্ছে একটি দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠির ভাষা। যা তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যবহার করে। মাতৃভাষা বহতা নদীর মতো শত ধারায় প্রবহমান। বাঙালির মাতৃভাষা হচ্ছে বাংলা। বাংলা আমাদের প্রাণের স্পন্দন, বাংলা আমাদের অহংকার।

মাতৃভাষার গুরুত্বঃ

প্রখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন- 'মা, মাতৃভূমি এবং মাতৃভাষা- এই তিনটি জিনিস সবার কাছে পরম শ্রদ্ধার বিষয়।' মাতৃভাষার মাধ্যমেই মানুষ প্রকাশ করে তার আশা-আকাঙ্খা, আবেগ-অনুভূতি। মাতৃভাষাই মানবজীবনের সকলক্ষেত্রে তৃপ্তি ও পরিপূর্ণতা দান করে। জাতীয় জীবনে মাতৃভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। জাতীয় জীবনের সার্বিক ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করতে হলে মাতৃভাষার কোনো বিকল্প হতে পারে না। শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, শিল্প-সংস্কৃতি ও সাহিত্যের বিকাশে মাতৃভাষা হচ্ছে প্রধান মাধ্যম। কবি রামনিধি গুপ্তের ভাষায়-

নানান দেশের নানান ভাষা
বিনা স্বদেশি ভাষা;
পুরে কি আশা।

মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার্থে প্রাণদানঃ

বাঙালি পরিচয়ে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর মতো গৌরবজ্জ্বল মহিমা যুগে যুগে বহুবার বাঙালি অর্জন করেছে। বিদেশি শাসনের অপচ্ছায়ায় বারবার ম্লান হয়ে গেছে আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পরে বাংলার উপরে নেমে আসে উর্দূর অপচ্ছায়া। পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল মুহম্মদ আলী জিন্নাহ যখন ঢাকার বুকে দাঁড়িয়ে দম্ভ করে ঘোষণা দেন 'Urdu and only Urdu shall be the state language of Pakistan' তখন প্রতিবাদে, ক্ষোভে ফেটে পড়ে বাংলাভাষী লাখো জনতা। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি স্বৈরাচারী পাকিস্তানি মিলিটারির রাইফেলের গুলিকে উপেক্ষা করে বীর বাঙালি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে। ঢাকার রাজপথ সেদিন লাল হয়ে যায় রফিক, শফিক, সালাম, বরকত, জব্বারসহ নাম না জানা অনেক তরুণের তাজা রক্তে। ভাষার জন্য জীবন দেবার এরকম নজির পৃথিবীর ইতিহাসে আর নেই। এজন্যই বাঙালি একুশে ফেব্রুয়ারিকে শহিদ দিবস হিসেবে পালন করে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ:

ইতিহাসে যতদূর জানা যায় তা হল, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বপ্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন কানাডার ভেঙ্কুভারে বসবাসকারী দুই

বাঙালি রফিকুল ইসলাম এবং আব্দুস সালাম। তাদের সার্বিক উদ্যোগে প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয় "মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ লাভারস অব দ্য ওয়ার্ল্ড" নামে একটি সংগঠন। এরপর আরও নানা সুধীজনের সহযোগিতায় বিভিন্ন ওঠাপড়ার শেষে ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর প্যারিস অধিবেশনে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণার প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। সেই অধিবেশনেই মোট ১৮৮টি দেশের সমর্থন সহযোগে প্রস্তাবটি পাশ হলে তার পরের বছর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের ২১ তারিখে জাতিপুঞ্জের সদস্য দেশগুলিতে যথাযথ মর্যাদায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়ে আসছে। এরপরে ২০১০ সালের একুশে অক্টোবর সাধারণ পরিষদের ৬৫তম অধিবেশনে জাতিপুঞ্জ স্বয়ং একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে পালনের উদ্যোগ নেয়। এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছিল বাংলাদেশ। তার পরের বছর মে মাসে জাতিপুঞ্জের ১১৩ সদস্য বিশিষ্ট তথ্য বিষয়ক কমিটিতে উক্ত প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রতিষ্ঠা পূর্ণতা লাভ করে।

স্মৃতি সংগ্রহ ও সংরক্ষণঃ

ভাষা একটি দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। আর এই ঐতিহ্যকে আজো বাঙালি অন্তরে ধারণ করে রেখেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ(ডাকসু) সংগ্রহশালায় আজো সংরক্ষিত আছে ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি বিজড়িত সেই আমগাছের অবশিষ্ট অংশ, যেখানে গুলি চালানো হয়েছিল ভাষা শহীদদের ওপরে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে অতি যত্নের সাথে সংরক্ষণ করা হয়েছে ভাষা আন্দোলনের অনেক মূল্যবান তথ্য ও চিত্র।

স্মরণে ও বরণে ২১ শে ফেব্রুয়ারি:

ঐতিহ্য ও আচার অনুষ্ঠান পালনে বাঙালির তুলনা মেলা ভার। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২১শে ফেব্রুয়ারিকে বাঙালি অনেক আগ্রহ অনুরাগ আর ভালোবাসার সাথে পালন করে।

ছবিঃ মীরসাব

"আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো ২১ শে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি"

আপামর বাঙালি জনতা এই আত্মার গানটি গেয়ে শহিদ মিনার প্রাঙ্গনে সমাবেত হয়ে, পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শহিদদের প্রতি অপার শ্রদ্ধা নিবেদন করে দিনটি শুরু করে। প্রভাত ফেরীর সেই ঐতিহ্য আজও ধরে রেখেছে বাঙালি। বাঙালির রঙে রঙে, পোশাক-আশাকে প্রকাশ প্রায় একুশের আমেজ। এছাড়া বিভিন্ন স্থানে সরকারি ও বেসরকারিভাবে আয়োজন করা হয় জারি, সারি, ভাওয়াইয়া গান, বাংলা কবিতা, নৃত্য ও আলোচনার অনুষ্ঠান।

মাতৃভাষা ও সাহিত্য:

মাতৃভাষা এবং সাহিত্যচর্চা পরস্পর ওতপ্রতোভাবে জড়িত। এই বক্তব্যটির প্রকৃত অর্থকে বুঝতে গেলে সর্বপ্রথম আমাদের সাহিত্যের স্বরূপ অনুধাবন করতে হবে। সাহিত্য হল আমাদের মনের ভেতরকার সেই সব কল্পনা যাকে আমরা ভাষার মাধ্যমে জীবন্ত রূপ দিতে চাই। এ-বিশ্বে যা কিছু প্রাকৃতিক এবং স্বাভাবিক, তা সব কিছুই সুন্দর। মানুষ স্বাভাবিকভাবে নিজের মনের অন্দরমহলে সাহিত্যিক কল্পনার রূপ দান করে আপন মাতৃভাষায় চিন্তার মাধ্যমে। তাই কোন মানুষ যদি নিজের মাতৃভাষায় দুর্বল হয়, তার পক্ষে সমৃদ্ধ সাহিত্যকে রূপ দান করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এমন সাহিত্য গড়ে উঠলেও তা নিজের স্বাভাবিকত্ব হারিয়ে সুন্দরকে পাশ কাটিয়ে হয়ে পড়ে দুর্বল। খেয়াল করলে দেখা যাবে এই পৃথিবীতে বিশ্বমানের যত সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে প্রত্যেকটির পিছনে লেখক

বা লেখিকার মাতৃভাষার অবদান সবথেকে বেশি। কারণ নিজের মাতৃভাষায় যত স্নিগ্ধ বা নির্মল ভাবে চিন্তা করা যায় পৃথিবীর অন্য কোন ভাষায় অসীম জ্ঞান থাকলেও আবেগের অভাব হেতু চিন্তার সেই স্নিগ্ধতা বা গভীরতা, কোনটাই আসে না।

মাতৃভাষা ও বর্তমান বাংলাদেশ:

বাংলাদেশ বরাবরই নিজের মাতৃভাষার রক্ষার প্রতি অপরের তুলনায় অধিক সচেতন এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। যে ভাষাকে রক্ষার জন্য ঝরেছিল তাজাপ্রাণ, বোবা হয়েছিলো মায়ের কান্না, সেই ভাষা রক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভূমিকা অনস্বীকার্য। দক্ষিণ এশিয়ার বুকে ক্ষুদ্র এই দেশটির মাতৃভাষা বাংলা; বাংলা ভাষাকে এই দেশ নিজের মায়ের মত করে ভালোবাসে। বলা হয়ে থাকে বাংলা ভাষার সংস্কৃতি ও কৃষ্টিকে পরম যত্নে বাংলাদেশ বাঁচিয়ে রেখেছে। বাংলাদেশের জাতীয় ভাষা হিসেবে বাংলা পৃথিবীর বুকে নিজের এক অন্যতম স্থান করে নিয়েছে। বাংলাদেশ প্রমাণ করে দিয়েছে এই ভাষার অবলম্বনকারী মানুষ নিজের সংস্কৃতি এবং কৃষ্টিকে রক্ষায় রক্ত ঝরাতেও পিছপা হয়না।

২১ শে ফেব্রুয়ারি এর দীক্ষাঃ

শুধুমাত্র উৎসবের মধ্যে একুশকে সীমাবদ্ধ রাখা মোটেই আমাদের কাম্য হতে পারে না। একুশ আমাদের যে শিক্ষা দিয়েছে তা আমাদের দীক্ষা হিসেবে নিতে হবে। একুশ হবে আমাদের কর্মচাঞ্চল্যের উদ্দীপনা। ২১-এর সত্যিকার ইতিহাস আমাদের নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে হবে। বাংলা ভাষার বিকাশ ঘটানোর জন্য আমাদের সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে। যে লক্ষ্যে আমাদের দেশের মেধাবী ছাত্ররা জীবন দিয়ে গেছে সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদেরই পদক্ষেপ নিতে হবে। সার্বিক সামাজিক চরিত্রকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও মাতৃভাষার অবদান সবচেয়ে বেশি। তাই কোন সমাজে মাতৃভাষায় অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ, ভাষার বিকৃতি এবং অবজ্ঞা সমাজের নৈতিক অবক্ষয় ডেকে আনে, যা পরবর্তীতে একটি জনগোষ্ঠীর পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

পরিশেষে বলা যায় যে, মাতৃভাষা হল মায়ের ভাষা। মা যেমন তার সন্তানকে স্নেহের বন্ধনে আগলে রাখে, তেমনি মাতৃভাষাও একটি নির্দিষ্ট ভাষাগোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে ইতিহাসের স্নিগ্ধ বন্ধনে জড়িয়ে রাখে। সেজন্যই মাতৃভাষা আমাদের সকলের কাছে পরম আবেগের। নিজেদের এই আবেগকে রক্ষা করার জন্য আমাদের অনতিবিলম্বে সচেতন হতে হবে। নিজেদের ইতিহাসকে ও ভাষার ঐতিহ্যকে আপন করে নিয়ে বর্জন করতে হবে বিকৃতি ও অপসংস্কৃতিকে। নতুন প্রজন্মকে বিশ্বায়িত করার সাথে সাথে তাদের আপন ভাষা ও সংস্কৃতির ব্যাপারেও সচেতন করে তুলতে হবে প্রতিনিয়ত। আমাদের মনে রাখতে হবে নিজেদের মাতৃভাষার চর্চায় আছে "প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ ও আত্মার শান্তি"। এই লক্ষ্যগুলি সফল হলে তবেই আমাদের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উৎযাপন সার্থক হয়ে উঠবে।

ছবিঃ মাহিবা

Interrelationship between German and English language

Debotree Mallick

Motivation: how and in which context two languages interact?

Each language has a history, origin, impact and acceptance to the people of another country, for example, many people in Germany use English words in their everyday life, so words like “hi,” “cool,” and “okay” are heard quite often in casual conversation, but even in business, and information technology (IT) English words are used by the Germans, for example, words like “marketing,” and “software”. Although these words are not in German, they have become so commonly used everywhere that people often do not notice when a word is said in English, not in German. Specifically, the aspects covering the daily life of a German person. How did English become regularly used by German people, and how much does it influence the language?

How one language can affect another language depends on the nature of the communication between the people of two languages[1]. To explain how the English language influences the German language, we need to know first how and which context people of these two languages began to interact. What do they need to communicate with themselves, and why? Notably, it is important to discuss everything in the daily life of the people in two languages6. This essay, therefore, focuses on the factors that influence such a causal relationship between the German and English language. Particularly it considers the historical aspects, scientific, business and political, as well as the social aspects.

This essay employed the literature review methods and found that the English language influences many aspects of every-day life in Germany. It used the scientific materials (i.e. journal articles, books, reports, etc.) available online sources, and mainly, it analysed the relevant documents available in Mendeley online portal. (https://www.mendeley.com/).

Since the relation of one language to another is related to historical issues in many respects, it first discusses the historical relationship between English and German and the exchange process between them. Business and political relations are formed through historical relations; people migrate from one country to another, and therefore, cultural relations form between them. As a result, overall economic, social, cultural and political relations play a vital role in the exchange of language[6,7,8]. Languages are also exchanged through research and science. All of these topics are discussed briefly in this essay periodically.

Historical Context

Many people believe that the first influences of English on German started after the second world war (WW2), during the time Germany was being occupied by “The Big Four” (i.e. the United States of America (USA), Great Britain (UK), France and the Soviet Union) after the events of WW2. But English has been influencing German since the 18th century, where words like “der Express” and “der Kongress” is originated from in Germany.

The influence of English is, at first, only apparent in a few areas, namely fashion (e.g. “der Pullover”), but during the 19th century, the language begins to influence more of Germany’s official language. The popularity of Anglo-American dance moves during the 1920s introduced words like “Twist”. Furthermore, sports, for example, tennis and hockey, also became quite popular in Germany. [1,2]

Before the 19th century, English words were used only in literature or in a political sense.

Nevertheless, due to the Industrial Revolution in Europe, more words from English were used in German (e.g. Lift).[3]

The end of WW2, when West-Germany was occupied by Great Britain and the USA, increased the use of English words in Germany even more, because of the English and American occupation of Germany. The names of professions like "stewardess," "designer" and "entertainer" were adopted, the way they were (i.e. in English), into the German vocabulary, rather than translating the words. Moreover, after the fall of the Berlin Wall in 1989, East-Germany started using more English words as well.[2]

All these historical issues not only increased the influence of the English language had on the German language but also helped English become the world or dominating language in the world8. Which until the 1970s was French, and German until the end of the first world war (WW1). German lost its influence, because of the rise of Hitler's Nazi regime and, respectively, is the reason two world wars started.[3]

Moreover, while the British Empire did not directly influence Germany, it is one of the main reasons, if not the main reason, English became the global language. Which is also a factor to be considered.

The Empire began forming during the 16th century and lasted until the 20th century. During this time, the Empire proliferated, conquering almost a quarter of the world (24%). Due to this, it is also referred to as "the empire on which the sun never sets".[4] And even now after every colony has become independent, English is either the first or second official language in 70 countries.[5]

Moreover, with the rising popularity of American entertainment business, Hollywood, and music (e.g. Jazz and Rock) after 1945 and especially during the 1960s, English gained more influence all over the world.[6]

Scientific Context

Many documents have been published to claim scientific progress and discoveries. Most of the documents are written in English, regardless of the nationality of the researcher, and that is because over the last few decades, English has become the language of science[9]. While in the earliest days of science, everything was written in Latin, scientists later began publishing in their native language, until to this day, where English has become the language for most of the scientific documents published.[7]

A study published in 2012 by Research Trends (https://www.researchtrends.com/) claimed that around 80% of the journals kept in Scopus, a Dutch abstract and citation database for scientific documents, are published in English. Though the study does not say anything about the future, it mentions that the rate of English articles has increased over the past few years, and will most likely continue increasing.[8]

This increase in English publications means that journals or articles published in another language will not gain as much recognition as English journals and articles, because not as many people would be able to read and understand them.[7]

However, the subject fields of a research document also play a vital role in deciding the medium of communication, i.e. the language. According to the scientific report (this report covers the information collected from 1994 to 2011), articles about hard sciences (e.g. physical sciences) were prominently published in English (45%), Chinese (73%) or Russian (45%), while soft sciences (e.g. health or social sciences) tended to be published in French (37%), Italian (40%) or Spanish (30-40%)[8]. This overview demonstrated that articles not published in English usually focused more on the softer side of science.[8] Nowadays, however, the publication of articles in the researcher's native language has decreased,

regardless of which field those articles are about, to make them accessible to all.

While this fact seems unfortunate and unfair, having one universal language in a significant and still growing field, namely science, still has many advantages. One of which is that it has made one of the essential aspect of science easier: communication. One universal language helps scientists to communicate with each other, sharing their discoveries and theories, as they do not have to worry about a language barrier anymore.9 Moreover, due to the strong popularity of the world wide web (e.g. Internet), they can do so all over the world.

This essay explains why English influences the German language. But it is important to note that the English language itself is influenced by these factors, which similarly also influence the German language.

One such field that has influenced the English language is technology. Technology influences the life of everybody, as it becomes more advanced every day. In technology, there is a field, centred around communication using technology, called Information-Communication Technology (ICT). Items associated with this field are communication devices, networks and services. Exemplary, it makes providing information much more comfortable and faster, as messaging applications like Facebook's WhatsApp and email services like Google's Gmail exist.[10] Apart from the fact that many individuals use this function for this exact reason, it also has become prevalent in business.[11]

It includes that smartphones, one of technology's most successful inventions, not only influences the way people communicate but also the marketing business, because of their high demand. Such prevalent innovation in sciences also leads to business and politics, and therefore, influences the language and communication.

Business and Political Context

Often when Germans refer to their phones, they call them "Handys". While this word also exists in English, it is not used to refer to a mobile phone. The word is an anglicism, which is often used by foreign businesses, due to the influence globalisation has on marketing and business.[2] According to the Merriam-Webster Dictionary (https://www.merriam-webster.com/) anglicisms are words in another language with characteristic features of English (examples often used German would be "handy" and "einloggen").

One reason for using anglicisms or English words in business is that the German equivalents are often more complicated than the English words. So, for example, if someone were to hear the German word "Gruppenfinanzierung", the person would not associate it with the English word "crowdfunding", even though the word is a literal translation of the term. Another reason is that anglicisms can be understood not just in Germany, but anywhere. Because they have similarities to English, a language understood by most people in the world.[12]

Due to anglicisms being used frequently in business and in everyday life, it can lead to misunderstandings, as not every anglicism has the same meaning in both languages. For instance, in Germany supervisors are often referred to as "Chef", which is a word also used in English, but with a different meaning. In English, a "chef" is a skilled cook.

Slogans are the most important part in advertisements. They are easy to remember, because of their originality. And because they are repeated in every advertisement, they quickly become well known.[13] So, once people hear the slogan of a company, they immediately associate it with that company.

An example: When people hear the slogan "Haribo macht Kinder froh – und Erwachsene

ebenso." (Translation: "Haribo makes children happy – and adults as well.") they immediately think of the gummy bears, the confectionery firm Haribo produces. And as many businesses use anglicisms and English slogans (e.g. make-up company Douglas' slogan "Come in and find out") to appeal to a bigger a market[6], English is used more and more in the day-to-day life of German people.

Such situation worries many people, especially now that even the German dictionary Duden (https://www.duden.de/) has adopted more anglicisms and English words (e.g. brainstorming and meeting). Many people who love their native language, find it insulting that their language is influencing their language to a great extent. They think it is unnecessary to use many English terms when the words can easily be substituted with German words.[14]

English influences even politics in Europe and Germany. Words like "der Präsident," "die Debatte" and "das Parlament" derived from English in the 19th century, are commonly used in both languages nowadays.[2] On the website of the European Parliament (https://www.europarl.europa.eu/portal/en) it is stated that there are 24 official languages, but the languages most used are English, German and French. Now that the UK wants to leave the European Union (EU), the Brexit being finalized by the end of January of 2020, people are debating if English should remain an official language in the EU. So even though few member countries of EU frequently use English (e.g. Ireland), the UK was the only country that chose English as its official language, which means that English can no longer be an official language in the EU.[5,15]

European Parliament's constitutional affairs chairwoman, Danuta Hübner, during a press conference (2016), states: "English is our official language because the UK has notified it. If we do not have the UK, we do not have English." According to her, the language might remain a working language in the EU, but for it to stay an official language, all member countries would have to agree.[15]

The criticism of anglicisms and English words in German vocabulary, becomes most evident in this field, like politics and business influence many aspects of a person's life, and many do not like it. As mentioned above, they do not like how much English is used in general conversation.

Social Context

"Was geht, bro?", "Cool!" and "Jo, das ist echt voll nice." are phrases German teenagers use quite often when speaking to their peers. The German youth language is not only influenced by English terms, phrases from the German middle ages (e.g. "Ehrenmann"), and Arabic languages, are often used as well. In 2016 the most famous phrase in Germany's youth language was "Fly sein".[16] When something is "fly", that means it is very cool. English sounds more direct and modern, which is why not only businesses but young people use anglicisms and English words to market their product as well.[6]

The USA is very successful in the entertainment industry (e.g. Hollywood), earning much money through films and music. Since music and films are very popular with people, especially adolescents, all over the world, many popular things among American people are introduced through these media.[17]

Migration to and from English speaking countries also shapes the way English influences other languages and is influenced by other languages. As languages evolve throughout history, they are influenced by other languages. This is how, for example, dialects of a language arise (e.g. Carribean English, a dialect which came to be, because of the way, Carribean immigrants spoke in English).

Children of immigrants or children, whose parents share different ethnic backgrounds, are being influenced by two or more cultures, which enables them to learn the languages of those cultures almost, if not entirely perfect.

This influence by two or more sources can also lead to some variations in language, as it has happened with German. In Germany, though not necessarily through English, the change in language caused by Migration, is called "Kiezdeutsch". A colloquial language is spoken most commonly by teenagers, or younger people, who have a migration background, in general. Kiezdeutsch and other European equivalents are not only used for comedic purposes but also to simplify the language.[18]

An example:

Instead of saying "Morgen werde ich ins Kino gehen.", one would say "Morgen ich geh Kino." The second sentence is shorter and is grammatically incorrect. But it still contains the same information as in the first sentence, so the second sentence becomes more direct and less complicated.

The same can be said about anglicisms and Denglisch. Denglisch, according to the Duden is a combination of both English and German. One example for Denglisch is "Fotoshooting", where the English word "photo shooting" is Germanized by changing the writing.

These particular expressions and grammatical sentence structures have developed due to migration to and from another country, and they are used to not only simplify the language but also help individuals express themselves. "How people talk reflects how they perceive themselves within a society."[19] Expressing the individuality of someone is also made more comfortable, due to the influence they have on the language.[17]

The use of English and German in the same sentence, or the following sentences, can also be used to emphasise something. For example, when congratulating someone for their birthday, saying "Herzlichen Glückwunsch! Happy Birthday!" emphasises the felicitation, making it more powerful.

A language gets a wider-acceptance

This essay explains the four majors aspects of how and to what extent the English influence on German briefly. As mentioned in the 'Business and Political Aspects' paragraph, the use (or over-use) of English in German conversation is also viewed from a critical perspective. Many newspapers articles question how much German is still used in conversation because English words and phrases are dominating conversation among the Germans. Moreover, there are some anglicisms and English terms cannot be replaced by German words[20], worries people, who are fond of their native language, even more. For example, the word "cool" is used in both languages, to describe a positive situation or moderate cold weather. The problem is that there is no direct German equivalent for this word. So even if people want to use less English, there are some words which they cannot replace or directly translate. But critics also argue that anglicisms are not necessary to communicate. They are like, every foreign word, used to make something sound better. Alternatively, they are used to help someone feel more included in a specific group.[20]

Furthermore, the influence of human migration has, leads to a "clash of languages".[21] In this case, it means that the German vocabulary, as well as its grammar, is changed, because of influences from various countries, who introduce their own culture and language through their people.

A language gets a wider-acceptance though its importance in business and political relationships arose from the historical ground of the world. Practically, it is due to that people migrate from one country to another and it develops socio-cultural and political relationships develop between them. As a

result, economic, social, cultural and political relationships all together play an essential role in language exchange. This essay considers these aspects in the analysis and found that English influences German the most in aspects regarding the scientific, business and social factors. Because these fields (i.e. business and science) have been continuously developing throughout time. The fact that most terms from the field of technology are not translated into German, further proves that English will always influence the way Germans talk to each other. Technology is becoming more critical and essential in the day-to-day life of humans, because of the digitising of many areas in society (e.g. schools), it can be said that English will influence more in the future on the German language. Moreover, business-wise, Globalization encourages the use of English in the work-life of a person. It is more comfortable and more practical to speak English during, for example, business meetings, as it has become the global language of the earth. To summarise, as English is easier to understand, by an audience that is not only in Germany, English will continue to exist in various aspects of the life of German people, to make communication between people of the same or different nationalities easier.

Reference

1. Jasova, M. Der Einfluss des Englischen und Amerikanischen auf die deutsche Sprache. (Masaryk-Universität Brünn, 2007).
2. Bobakova, H. Anglizismen im Marketingbereich. (Schlesische Universität, 2009).
3. Stoll, H. M. English Influence on German. 30 https://www.grin.com/document/65457 (2006).
4. Power, D. How big was the British Empire and why did it collapse? The Week https://www.historic-uk.com/HistoryUK/HistoryofBritain/Timeline-Of-The-British-Empire/ (2019).
5. Setter, J. Will Brexit spell the end of English as an official EU language? The Guardian https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/dec/27/brexit-end-english-official-eu-language-uk-brussels (2019).
6. Hammond, A. How did English become the world's most spoken language? ESL Stories https://blog.esl-languages.com/blog/learn-languages/english-language-global-number-one/ (2014).
7. Huttner-Koros, A. The Hidden Bias of Science's Universal Language. The Atlantic https://www.theatlantic.com/science/archive/2015/08/english-universal-language-science-research/400919/ (2015).
8. Weijen, D. D. van. The Language of (Future) Scientific Communication. https://www.researchtrends.com/issue-31-november-2012/the-language-of-future-scientific-communication/ (2012).
9. Drubin, D. G. & Kellogg, D. R. English as the universal language of science: opportunities and challenges. MBoC/Molecular Biology of the Cell https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3341706/pdf/1399.pdf (2012).
10. Ramey, K. Advantages and Disadvantages of Communication Technology in an organization. Useoftechnology https://www.useoftechnology.com/advantages-disadvantages-communication-technology-organization/ (2012).
11. Ramey, K. Technological Advancements and their Effects on humanity.

Useoftechnology https://www.useoftechnology.com/technological-advancements-effects-humanity/ (2012).
12. Rassek, A. Anglizismen: Was hinter dem Denglisch im Beruf steckt. Karriere Bibel https://karrierebibel.de/anglizismen/ (2019).
13. Stehr, C. The importance and influence of anglicisms in german language and audio-visual advertising. (Technical University of Braunschweig, 2002).
14. Heine, M. So viel Englisch steckt wirklich im Deutschen. Welt https://www.welt.de/kultur/article128260705/So-viel-Englisch-steckt-wirklich-im-Deutschen.html (2014).
15. Boyle, D. English language could be dropped from European Union after Brexit. The Telegraph https://www.telegraph.co.uk/news/2016/06/28/english-language-could-be-dropped-from-european-union-after-brex/ (2016).
16. 'Fly sein' ist 'Jugendwort des Jahres'. Süddeutsche Zeitung https://www.sueddeutsche.de/kultur/deutsche-sprache-fly-sein-ist-jugendwort-des-jahres-1.3255590 (2016).
17. Wittenberg, E. & Paul, K. „Aşkım, Baby, Schatz..." – Anglizismen in einer multiethnischen Jugendsprache. (University of Potsdam, 2009).
18. Paul, K., Freywald, U. & Wittenberg, E. 'Kiezdeutsch goes school' A multiethnic variety of German from an educational perspective. (University of Potsdam, 2009).
19. McWhorter, J. How Immigration Changes Language. The Atlantic https://www.theatlantic.com/international/archive/2015/12/language-immigrants-multiethnolect/420285/ (2015).
20. Pokorny, C. Anglizismen - Kolonialisierung der deutschen Sprache? Uni.de https://uni.de/redaktion/anglizismen (2016).
21. Bisky, J. Tradition der Beschimpfung. Süddeutsche Zeitung 3 https://www.sueddeutsche.de/kultur/veraenderung-der-deutschen-sprache-tradition-der-beschimpfung-1.1789617-0 (2013).

স্কেচঃ বাবুই

ছবিঃ মিশরাক

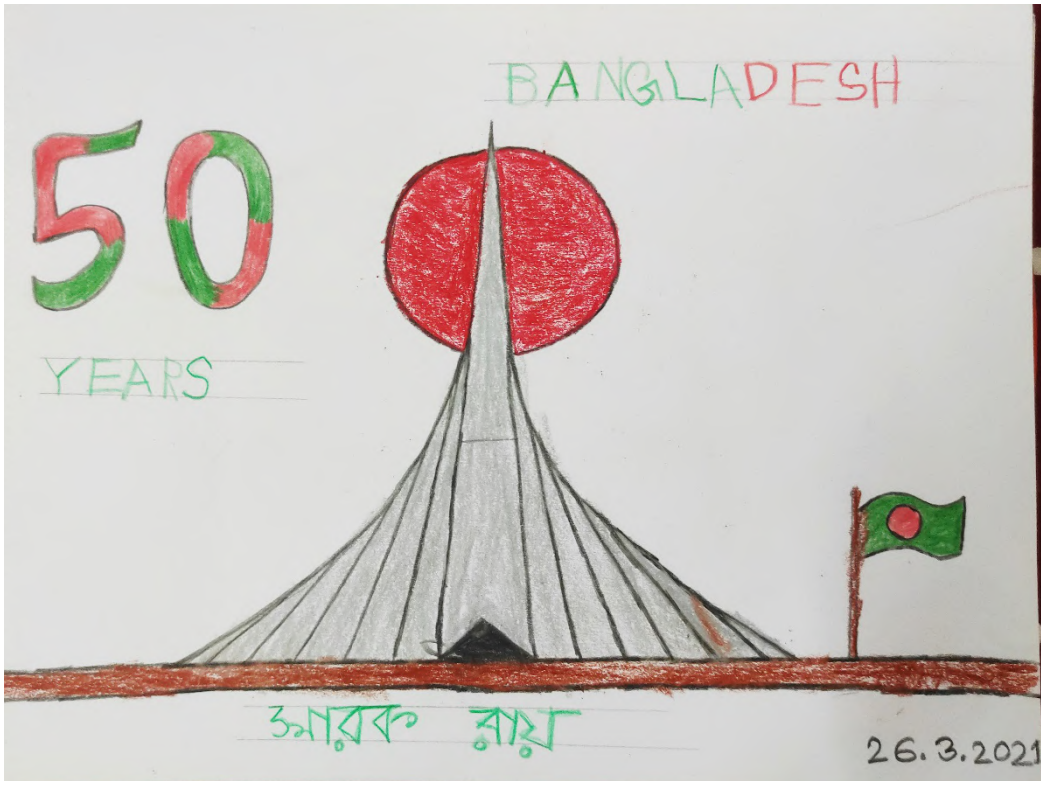

ছবিঃ স্মারক রায়

বলতে না পারা কথা

মোঃ খুরশীদ হাসান সজীব

জন্ম আমার মানুষের মুখে মুখে,
বসবাস করি সবার অন্তরে,
বেড়ে উঠা সকলের অনুভূতির ভিতরে,
খেলাধূলা করি আবেগের গণ্ডিতে,
অনুভব শুধুই তোমাদের হৃদয় গহিনে,
আমার আলোচনা যুগ থেকে যুগান্তরে।
বেঁচে থাকি সবার চর্চার মাঝারে,
আবার মরে যাই অনাদরে অবহেলায়।
আমি বিচরণ করি কাব্য কিংবা কবিতায়,
গল্প, নাটক বা উপন্যাসে হই মহিমান্বিত।
আমার অনুপস্থিতি মানেই বোবা সবাই,
কালা আবেগহীন এক অন্ধকারের যুগ।
আমাকে পাবার জন্য কত বাকবিতণ্ডা
প্রয়োজনে আন্দোলন যুদ্ধ রক্তপাত,
কতো মায়ের ছেলের জীবন উৎসর্গ।
মাঝে মাঝে হয়তবা বেঁচেও যাই,
তবে নীরবতায় হারিয়ে যাওয়ায় ভবিতব্য।
আমাকে নিয়ে মাঝে মাঝে-
অনেক উল্লাস হয়,
হয় আমাকে ধারণের নানান অঙ্গীকার।
আমি শুধুই নিরবতায় ঢুকরে কাঁদি,
ক্ষণিকের এই আবেগী ভালোবাসায়,
সবকিছুই যেন আলগা দেখানো ক্ষুদ্র সময়ব্যাপ্তিতে।
বাস্তবটা বড়ই নিষ্ঠুর এখন আবেগের কেনাবেচা,
অতি আধুনিকতার নামে চলছে ভেজাল কথা।
অবাধ আকাশ সংস্কৃতি করছে দেউলিয়া,
শুদ্ধ শব্দটা এখন এক অলিক কল্পনা।
মাঝে মাঝে এখন নীরবে হাসি পায়,
যার অধিকার পেতে একটি জাতি,
দিয়েছে তাজা রক্ত, এক বীরত্বের ইতিহাস।
আজ সে কত অবহেলায় হচ্ছে নিঃস্ব,
যন্ত্রশীল চর্চাই যখন অনেক প্রশ্নবিদ্ধ।
এভাবেই হয়তবা একদিন মুছে যাবে সব,
বীরগাঁথা, রক্তবান, অর্জন ইতিহাস সবকিছু।
পড়ে থাকবে শুধু নিরেট কঙ্কাল,
আবেগহীন, অনুভূতিহীন, রক্ত-মাংসবিহীন।

অমর শিল্পী আবদুল লতিফ

শহীদ আলতাফ মাহমুদ

আব্দুল গফ্ফার চৌধুরী

বাংলা ভাষার প্রতি ওনাদের
অবদান কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি
KUinEu

হাঙ্গেরিতে প্রথম দিন

এম. এম. আব্দুল্লাহ আল মামুন সনি

চোখ মেলে দেখি, মোবাইলে ১২ টা বাজে। ঘরের সবকিছুই নতুন। মাথার উপরে চেয়ে দেখি ছাদটাতে কোন ফ্যান নেই, আম্মুর কথা বা ভাড়াটিয়াদের চিৎকার কিছুই শুনতে পারছিনা। কেন এত নিঃশব্দ! ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল আমি আর আমার চেনা পরিবেশে নাই। আমি এখন আমার স্বপ্নের দেশগুলোর একটাতে। সত্যি কি এটা আমার স্বপ্নের দেশ! হবে হয়তো। এগুলো ভাবতে ভাবতে কখন ঘেমে উঠেছি বুঝতে পারিনি। শুয়ে আছি, ঠিক এমন সময়, ছিমছাম গড়নের সাদা চামড়ার একটা ছেলে এসে দরজা খুলে ঘরের লাইট জ্বালিয়ে দিলো। হঠাৎ চিন্তায় ভাটা পড়লো। একে আমি চিনি, গত রাতে এই ছেলেটাই আমার ডরমিটরি-ক্যাম্পুস হোটেলের (যা একটি তিন তারকা হোটেল) যে ঘরটিতে আমার নামে বরাদ্দ (বি ২০৮); তার দরজা খুলে দিয়েছিল। ঘরটি আমার একদিক থেকে পছন্দ হয়েছিল। আবার কিছু কারণে মনের মত হয়নি। ইউরোপে এ জাতীয় ঘরকে স্টুডিও এপার্টমেন্ট (studio apartment) বলে। কারণ, একটা ঘরের সাথেই রান্না ঘর এবং বাথরুম থাকে। বলা যায়, পারফেক্ট ব্যাচেলর ঘর। ঘরটি পছন্দ না হওয়ার কারণ ঘরটিকে আরো দু'জনের সাথে ভাগ করে নিতে হবে।

এমন ভাবছি হঠাৎ, ছেলেটি হাসি মুখে আমার কাছে প্রশ্ন করলো 'কেমন আছি'। আমার উত্তর জানার অপেক্ষা করলো না। দ্রুত বাথরুমে প্রবেশ করলো। আমি বিছানায় উঠে বসলাম, কমলা রঙের চাদর। অদ্ভুত লাগছিলো। নরম বিছানা। বেশ মজা পাচ্ছিলাম। মনে হয় এর সাথে স্প্রিং দেওয়া আছে। শরীরটা খুব দুর্বল লাগছে। সোজা হয়ে দাঁড়ানোর মত শক্তি পাচ্ছিনা। ছেলেটি বাথরুম থেকে বের হয়ে বলল হাতমুখ ধুয়ে নিতে। সে আমার জন্য কিছু রান্না করছে। শুনে খুবই ভাল লাগলো। আমি খুব ধীরে ধীরে বাথরুমে প্রবেশ করলাম। শরীরটা অনেক দুর্বল লাগছিলো। বাথরুমটা অনেক প্রশস্ত; কিন্তু মনে হলো কোনো এক আনাড়ি হাতের নকশার ফসল এটি। বেশিরভাগ স্থানই অব্যবহৃত বা ব্যবহারের অযোগ্য করে রাখা হয়েছে। মনে পড়ল আমার দেশের রাজমিস্ত্রিদের কথা। বিশেষ করে মধ্য বয়স্ক একজনের কথা যিনি নিজেকে কোনো একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার থেকেও দক্ষ মনে করতেন। আজ অবধি আমাদের বাড়ির কোনো একটা ঘরের দেয়াল সোজা করে গাঁথতে পারছেন বলে মনে পড়ে না। জানিনা, স্রষ্টার কি অপূর্ব খেলা! প্রতিবারই তাকেই হাতের কাছে পেয়ে যান আমার বাবা। কারণটা খুবই সহজ-তার দক্ষতা। তার দক্ষতা এবং বয়স উভয়ই তাকে ব্যস্ত থাকতে প্রতিহত করে থাকে। আর আমার বাবার যুক্তি, এই লোক যতটুকু ভাল তার থেকে অন্যরা আরো খারাপ। প্রতিবারই কাজ শেষ করে চলে যাওয়ার পর আমার বাবা আর মা উক্ত রাজমিস্ত্রির ভুল নিয়ে সমালোচনাই মুখর থাকেন। কিছুদিন বাদে আবার যখন একই জাতীয় কোন কাজের বিষয় সামনে আসে; তখন সেই ব্যক্তিকেই স্মরণ করা হতো। আর তারও 'ট্রায়াল এন্ড এরর' এর সুযোগটাও চলে আসতো। কিন্তু আজ আমি বুজতে পারছি আমার বাবা কেন এই ব্যক্তিকেই বারবার নিয়ে আসতেন। কারণ, যখন আমার বাবা তার সামনে উপস্থিত হতেন তখনই আমার বাবার সাথে মারফাতি বা দেহতাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করে দিতেন। আমার বাবার দেহতাত্ত্বিক বা ধর্মতত্ত্ব নিয়ে বিষদ জ্ঞান থাকায় এবং উক্ত বিষয়ের জ্ঞানপিপাসা উভয়ই ভদ্রলোককে তার চুক্তিভিত্তিক কর্ম ঘন্টা অতিক্রম করার সহজ পথ হিসেবে আবিস্কার করতে পেরেছিলেন। আর আমার বাবা অর্থের বিনিময়ে একজন শ্রোতা। আমি আজ অনুধাবন করলাম, মানুষ অন্য প্রাণী থেকে

ব্যতিক্রম। কেননা, সে তার অর্জিত জ্ঞান অন্যের মধ্যে বিতরণ করতে সর্বদা তৎপর।

আরে! হ্যান্ড সাওয়ার কই? অন্য সব কিছুই তো আছে। খেয়াল করলাম পায়ের কাছে ফুল গাছে পানি দেবার একটি প্লাস্টিকের পাত্র। বুঝতে কিছু বাকি রইলো না। কাজটা শেষ করে, উন্নত বিশ্বে অনুন্নত অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে যাবো। ও মা! এ দরজার চাবি কোনদিকে ঘুরালে মুক্ত হতে পারবো। এতো নতুন বিপদ। বার বার ঘড়ির কাটার দিকে-আবার ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ঘুরাতে ঘুরাতে হঠাৎ দরজা খুলে গেলো। উফ্ মুক্তির স্বাদ পেলাম, বুক ভোরে নিশ্বাস নিলাম। তাকিয়ে দেখি, ছেলেটি আমাদের ঘরের প্রাণকেন্দ্রে ১৬ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য-প্রস্থের খাবার টেবিলটাতে অনেক অচেনা খাবার সাজিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আর মুচকি হাসছে। পর্যাপ্ত পাত্রের অভাবে খুব সুন্দর করে সাজাতে পারিনি, এ হাসিটা যেন তারই ক্ষমা প্রার্থনা করছে। আমি আর বিশেষ কিছু না ভেবে খাবার টেবিলে বসে পড়লাম। খাবারে ছিল, আলু আর ডিম ভাজি, অনেকটা আমাদের দেশে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই এর মতন। মসলা বলতে শুধু লবণ মাখানো। জলপাই আর টমাটোর সালাদ, সাথে কিছু পাউরুটি। কিন্তু এই রুটিগুলো অনেক ভারি এবং সুস্বাদু। যদিও এখন সবই সুস্বাদু লাগছে। আম্মু বলত, খিদে পেটে সবই স্বাদ লাগে। আজ তার প্রমাণ পেলাম। অনেকটা খেয়ে নিলাম।

খেতে খেতে আমাদের মধ্যে কিছুটা আলাপ হলো। ছেলেটার নাম ওয়ালিদ, ও আলজেরিয়া থেকে এসেছে -মাস্টার্স প্রোগ্রামের ছাত্র। ওর দেশে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম তিনজনের মধ্যে থাকে তারাই সরকারি সহযোগিতাই হাঙ্গেরিতে পড়ার সুযোগ পায়। শুনে আমি নিজেকে অনেক সৌভাগ্যবান মনে করলাম। কেননা, এমন কোন নিয়ম থাকলে আমি আজ তার সাথে আহার গ্রহণ করার সুযোগ কখনওই পেতাম না। কথা বলতে বলতে, ছেলেটা উঠে পড়ল। বলল তার এখনই বের হতে হবে। তার একটা ক্লাস আছে এগ্রিকালচার ফ্যাকাল্টিতে, যা প্রয় ৬ কিলোমিটার দূরে। বলতে বলতে সে কতটা ব্যস্ত তা আমাকে বুঝাতে লাগলো। তার আজ চারটি ক্লাস, শহরের চারটি কোণে। স্থির হয়ে বসার সুযোগই কম। তাকে কি বলবো বুজতে পারছিলাম না। এমন সময় মনে পড়ল তাকে কিছু উপহার দিতে পারি। দেশ থেকে গুটি কয়েক গামছা এনেছিলাম। উপহার হিসাবে তাকে একটা দিলাম। তাকে আরো কিছু উপহার দিলাম। এই অচেনা শহরে তার আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়েছি। যাইহোক, ক্যাডবেরি পেয়ে যতটা খুশি সে হয়েছে তা গামছা ও অন্যান্য উপহার পেয়ে হয়নি। আমার সাথে খাবার বলতে কিছু চিড়া এবং কিছু খেজুর ছিল। খওয়ার সময় সে বলেছিল, তার দেশের খেজুর খুবই বিখ্যাত, কি আশ্চর্য আমি বাংলাদেশ থেকে যে খেজুর নিয়ে এসেছিলাম সেটাও আলজেরিয়ান। আমি তাকে দেখাতেই সে খুব খুশি হয়ে গেলো। এটাই হয়ত স্রষ্টার খেলা।

দুপুর ২টা বাজতে যাচ্ছে-বাহিরে রোদ ঝলমল করছে। অনেক ছেলে-মেয়ে ঘোরাফেরা করছে। দেখে আমার খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে গেল। ছেলে-মেয়েদের রোদকে উপভোগ করার দৃশ্যটা ছিল আসলেই দেখার মত। দেব্রেসান বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকগুলো ক্যম্পাস, বলা যায় পুরো দেব্রেসান শহরটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতর। আমার ফ্যাকাল্টি ও থাকার জায়গা দু'টোই কাঁসাই ক্যম্পাসে। ক্যম্পাসটি অনেক খোলামেলা। মাজখানে বেশ প্রশস্ত একটা মাঠ, তার কেন্দ্রে স্বচ্ছ পানির একটা ফোয়ারা। ফোয়ারাটা ঘিরে বিভিন্ন নকশা করা বেঞ্চ যার বেশীরভাগটাতেই মোবাইল আর ল্যাপটপ চার্জ দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা। কিছু বেঞ্চ দেখতে পানির ঢেউ এর মত। চাইলেই যে কেউ একটু আয়েশ করে বসতে পারে আবার শুতেও পারে। অনেকেই শুয়ে থাকতে দেখলাম। ক্যাম্পাসটা একটু চক্কর দিতে দিতে মনে হল, আমার একটা মোবাইল সিম কেনা উচিৎ, যাতে এই শহরে পথ চিনে হোটেলে ফিরতে পারি। আমি, ফিরে গেলাম রিসিপশনিস্ট এর কাছে। রিসিপশনিস্ট আমাকে ফরুমে যেতে বলল। ওখানেই সবকিছু পাওয়া যাবে। কাম্পসের

সামনে বাস স্টপেজ থেকে ৫ নং বাস ধরে যেতে হবে। তার ইংলিশ বলাটা বেশ হতাশ করলো আমাকে।

তার পরামর্শ অনুসারে আমি, ফরুমের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম। বাহিরে আসতেই মহাবিপদ, ডানে-বামে সামনে সবই তো বাসস্টপেজ। কোনটাই গিয়ে দাঁড়াবো। ক্যম্পাসের গেটের বাহিরে বাম হাতের প্রথম বাসস্টপেজটার বেঞ্চটাতে গিয়ে বসলাম। প্রায় পনের মিনিট বসে থাকলাম। কোন বাসের দেখা নাই। অনেক কিছু ভাবছি আর সবকিছু দেখার চেষ্টা করছি। রাস্তাগুলো অনেক পরিস্কার। যদিও গাছের পাতা পড়ে আছে, কিন্তু কোনো ময়লা নাই। ভবনগুলো অনেক জায়গা নিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। বাতাসে গাছের পাতাগুলো যেন ক্লান্তিতে ঝরে পড়ছে। বেশ ঠাণ্ডা লাগছিলো। আমি হাতমোজা আর কানটুপি ছাড়া সব রকমের শীতের কাপড় পড়ে আছি আর দেখছি কিছু ছেলেমেয়ে হাফ-প্যান্ট আর গেঞ্জি পরে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিছুক্ষণ পর একজন মা তার ১২/১৩ বছর বয়সের বাচ্চা সহ এসে আমার পাশে এসে উপস্থিত। বেশ ভাল লাগলো। এ অনুভূতি একাকীত্ব ঘোচার অনুভূতি।

১/২ মিনিট পর আমি বাচ্চাটার মায়ের কাছে জানতে চাইলাম এই রাস্তাই কি ফরুমের দিকে গিয়েছে? ভদ্র মহিলা ইংরেজী না জানায় ইশারাতে বোঝালেন আমায়। কিন্তু তার বাচ্চাটা আমাকে অবাক করে দিয়ে সঠিক পথের ঠিকানা দিলো। আমি দ্রুত সেখানে গেলাম। সেখানে দেখি দুইজন ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। তাদের বয়স আশির নীচে হবে বলে মনে হলো না। আমি তাদের কাছে ফরুমে যাওয়ার বিষয়ের বলতেই তারাও জানিয়ে দিলেন তারা ইংলিশ বুঝেন না। কিন্তু তারা এখানেই থেমে জাননি। তাদের মধ্যে একজন আমাকে পাশের একটা চার্ট দেখাতে নিয়ে গেলেন। ইশারা করে কিছু বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন। কি বলব- আমি তো কিছুই বুঝছিলাম না। ঠিক তখনই, অপর একজন ভদ্রমহিলা আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন। দেখলাম, মুহূর্তেই ২২ নং বাস এসে থামল আমাদের সামনে। বাস থামতেই দরজা খুলে গেলো। কোন হেল্পার নেই, নেই কোন কনট্রাক্টর। ভদ্রমহিলা প্রায় আমাকে ঠেলে বাসে তুলে দিলেন। আমাকে বাসে তুলে দিয়ে, বাসের চালককে কিছু বলে দিলেন। মনে হয় আমি নতুন, সেটা বুঝিয়ে দিলেন। আমি তাদের ধন্যবাদ জানানোর আগেই বাসের দরজা বন্ধ হয়ে গেলো এবং বাসটি চলতে শুরু করলো। আমি জানালা দিয়ে বাইরে দেখবার চেষ্টা করলাম (যদিও এ বাসের জানালা খোলা যায় না)। স্বচ্ছ জানালা দিয়ে দেখলাম, সে বয়স্ক ভদ্র মহিলা দু'জন অন্য পথে হাটা শুরু করেছেন। বুজলাম না, তারা তাহলে কেন বাসের যাত্রী ছাওনিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন? ওটা কোন আরামদায়ক জায়গা তো ছিল না!

আমি গতরাতেই বুঝে গিয়েছিলাম যে, বাসের টিকিট বাসের চালকের কাছ থেকে কিনে নিতে হয়। বাসের চালক ভাল ইংলিশ বলতে পারেন। আমি তার কাছে টিকিট চাইলে তিনি আমাকে বসতে বললেন। তার ২ টা স্টপ পর বাসটি একটি ট্রাফিক সিগনালে এসে দাঁড়াতেই তিনি লুকিং গ্লাসে ইশারা করে আমাকে ডেকে নিলেন। আমাকে একটা টিকিট দিয়ে ৪৫০ ফরিন্ট (ফরিন্ট হলো হাঙ্গেরীর স্থানীয় মুদ্রা) দিতে বললেন। এইবার হল সব থেকে মজার ব্যাপার। আমার কাছের সব থেকে ছোট নোটটি ছিল ১০,০০০ ফরিন্টের। আমি সেটি তাকে দিলাম। দেখলাম তার চোখে কপালে- কোনো এক অজানা দুশ্চিন্তার ছাপ। কারণটা অতি সহজ- তার কাছে খুচরা ছিল না। তিনি আবার আমাকে বসতে বললেন। ট্রাফিক লাইট সবুজ হতেই গাড়িগুলো একসাথে ছুটতে লাগলো। আমি বসে পড়লাম। বাসটি এক ঝটকাই অনেক দ্রুত গতিতে ছুটতে লাগলো। আমি দ্রুত বসে পড়লাম। বাসটি আমার চির চেনা বাস হতে অনেক আলাদা। বাসের মেঝের উচ্চতা পাশের পথচারীর চলাচলের পথের উচ্চতার সমান। উঠতে নামতে কোন যাত্রীর কষ্ট না হয়। পরের স্টপেজে দেখলাম একজন মা তার ছোট্ট শিশুর ট্রলিসহ কি সুন্দর

অনায়াসে বাসে উঠে পড়লো। কিছু দূর যেতেই, বাস চালক আমাকে ইশারা করে আবার ডাকলেন। আমাকে অবাক করে তিনি আমার নোটটা ফেরত দিয়ে আমাকে নেমে যেতে বললেন এবং আঙুল দিয়ে বললেন রাস্তার অপর পাশে ফরুম। আমি তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বাস থেকে নেমে গেলাম।

এবার ঘটলো আরেক মজার ঘটনা। আমি সঠিকভাবে রাস্তা পার হয়ে, বড় করে 'ফরুম' লেখা দেখে, যে স্থান থেকে পণ্য আনা-নেওয়া করে সেখানে প্রবেশ করে ফেললাম। সেখানে বিশাল দেহী দুইজন ভদ্রলোক আমাকে দেখে এগিয়ে আসলেন। তাদের পরনে নিল রঙের কর্মীদের পোশাক। আমি তাদের দেখে ভয়ের পরিবর্তে ভরসাই পেলাম। কারণ আমিও বুঝতে পেরেছিলাম আমি পথ ভুল করেছি। তাদের মধ্যে থেকে একজন আমার কাছে হাসিমুখে বলল-নিউ? আমার হ্যাঁ-সূচক উত্তরে তারাও বেশ মজা পেল। মানুষের কাঙ্খিত জিনিস পেলে যেমনটা খুশি হয়। আমিও তাদের হাসিতে যুক্ত হলাম। তারা আমাকে বাহিরের পথ দেখিয়ে দিল এবং একজন সাথে করে প্রবেশের পথও দেখিয়ে দিল। আমি ফরুমের প্রবেশ করলাম।

ফরুম আসলে একটা সুপার মার্কেট। আমাদের ঢাকার বসুন্ধরা মলের মতন। তিনতলা, মাটির নীচে একতলা আর মাটির উপর দোতলা। বসুন্ধরার মত অত বড় না হলেও অনেক সাজানো গোছানো। বিশ্বের সকল নামি-দামি ব্রান্ডের সমাহার। আমি মোবাইল সিমের দোকান খুজতে লাগলাম। দেখলাম, Telekom, Vodafone, Telenor। আমি টেলিকম সিম নিবো বলে সিদ্ধান্ত নিলাম। আমার রুমমেটও সেটাই কিনেছিল। আমি টেলিকম এর কেয়ার সেন্টারে গেলাম। দেখলাম একটি মেশিনের মাধ্যমে সবাই সিরিয়াল দেওয়ার টোকেন নিচ্ছে। আমি দেখলাম, সেখানে ইংলিশ যে কত প্রকার, তা দেখে তার মধ্যে যে কোনটা নেওয়া উচিৎ হবে আর কোনটা হবে না, সেটাই বুঝতে পারছিলাম না। আজ মনে পড়ছিল গুরুজির (ড. তুহিন রায়) কথা। প্রায় প্রতি রাতে, স্যারের জানা এজেন্টের সাথে কথা বলার সুযোগ আছে। খুশির আরেকটা কারণ আমার সামনে মাত্র ৬ জন। দেখলাম বুথ আছে ৪ টা। আমি ভাবছিলাম এইতো আমার সিরিয়াল আসল বলে। অপেক্ষার প্রহর গুনতে গুনতে প্রায় ১ ঘন্টা ১৭ মিনিট পর আমার ডাক এলো। এই সময়ের মাঝে আমি খেয়াল করলাম যে, প্রতিটা কাস্টমারকে তারা অনেক সময় দিচ্ছে। তাদের নিবিড় পরিচর্যা দেখে বেশ ভালই লাগছিলো। কিন্তু যখন আমি তাদের কাছে গেলাম তখন তাদের সেবা দেওয়ার গতি দেখে বেশ হতাশ হলাম, মনে পড়ে গেল আমাদের দেশের পুরাতন ব্যাংকের কর্মকর্তাদের কথা। বর্তমানে আমাদের দেশের সেবা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের গতি এদের চারজনের গতির থেকেও অনেক বেশি এবং তাদের সেবা দেওয়ার সংখ্যাও এদের থেকে অনেক বেশি। আমি আরো হতাশ হলাম যখন দীর্ঘ ১০ মিনিট তার সামনে আমাকে অপেক্ষমান রেখে আমার পাসপোর্ট-ভিসা পরীক্ষা করে জানালেন যে তাদের সিম শেষ হয়ে গেছে। আগামীকাল সকালে আসলে সিম দিতে পারবে। আমি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম। সত্যি বলতে আমার আর তাদের সাথে কথা বলতেও ইচ্ছা করছিল না। অপেক্ষার সময় অনেক দীর্ঘ হওয়ায় ক্ষুধাও লেগেছিল বেশ।

তিনতলায় দেখলাম অনেক খাবারের দোকান। কেএফসি সেগুলোর মধ্যে আমার পরিচিত, কিন্তু সেখানে যে দীর্ঘ লাইন ছিল তা দেখে সেখানে যাওয়ার সাহস হয়নি। একটু সামনে এগোতেই দেখি একটা বড় সুপার সপ। সবজি থেকে মাংস সব কিছুই আছে ওখানে। ঠিক আমাদের খুলনার 'সেভ অ্যান্ড সেভ' এর মত। আমি ট্রলি নিয়ে প্রবেশ করলাম। গবেষণায় কিছুটা অভিজ্ঞতা থাকলেও সাংসারিক বাজার-সদায়ে একেবারেই আমি অদক্ষ একজন মানুষ। এক সাধারণ রুটির সাথে যখন কাজ শেষ করে ফিরতাম, তখন গল্লামারি কাঁচা বাজার থেকে স্যার কিছু বাজার করতেন। আর প্রায় একটা প্রশ্ন করতেন- "ও সনি, বাসায় বাজার-টাজার করো?" আজ তার

প্রশ্নের উদ্দেশ্য বুজতে পারছি। ভাবতে ভাবতে, দেখলাম সার্ডিন মাছের সালাত মাত্র ২.৫৫৪ ফরিন্ট। এত সস্তা! আমি ২/৩ টা নিয়ে নিলাম। এরকম দশমিক যুক্ত মুল্যের আরো বেশ কিছু পণ্য কিনে ফেললাম। তবে বেশীরভাগ কমা যুক্ত মুল্যের পণ্য বাদই দিলাম। সবকিছু কিনে, যখন আমি খুব খুশি মনে আমার রুমে ফিরলাম। তখন আমার রুমমেট এগুলা দেখে তো অবাক। ভাবলো যে, আমি কত ধনী একজন মানুষ। তার হিসাব মতে আমি তিন দিনের খাবারের জন্য যা খরচ করেছি তা দিয়ে একজন মানুষের সারা মাসের খরচ করেও হাতে বেশ কিছু অর্থ থেকে যাবে। আমি বললাম কিভাবে? আমিতো বাজারের সব থেকে সস্তা জিনিসগুলোই নিয়ে এসেছি।সে বলল, তুমি সস্তা না সবথেকে দামি জিনিসগুলোই নিয়ে এসেছ। এগুলো সাধারণত কোনো অনুষ্ঠানের জন্য নেওয়া হয়। আমি ভুলটা কোথাই করেছি বুজতে পারছিলাম না। ঠিক তখনই সে আমাকে একটা সার্ডিনের কৌটা তুলে বলল দেখ এই একটা কৌটার জন্য তুমি দুইহাজার পাঁচশত চুয়ান্ন ফরিন্ট খরচ করেছ। আমার আর বুঝতে বাকি রইলনা। আমি ভুলটা 'দশমিক' আর 'কমা'-তে করেছিলাম। যাইহোক, খাবারগুলো খেয়েছিলাম বেশ মজা করেই। দ্রুত ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করলাম; কিন্তু পরবর্তী দিনগুলা কিভাবে হিসাব করে কাটাবো, সেটাই বার বার ঘুমের বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। অর্থ শোক আসলেই বড় শোক...!!!!!

ফ.ক্রে. জাবের

স্কেচঃ নিতুই

স ম য়

মফিজুর রহমান

আমার শহরে চুপিচুপি রাত নেমে আসে। আলোর বন্যায় ভেসে যায় চারিদিক। আমি বাতিহীন ঘরে নকশী কাঁথার নিচে গুটিশুটি মেরে শুয়ে থাকি। এই শহরের আলো উৎসবে আমি নেই। জগতের কোন উৎসবেই আমি নেই। আমি আমার ব্যক্তিগত উৎসবে মেতে থাকি, অন্ধকারে সময়ের সাথে কথোপকথন।

বাতাসেরও কান আছে, শুনতে পায়। সময়েরও মুখ আছে, বলতে পারে। আমার সময় ধীর-স্থিরভাবে তার গল্প বলে যায়। আমি আলো জ্বালালেই থেমে যায় সময়ের গল্প বলা। তাই আলো না জ্বেলে চুপচাপ গুটিশুটি মেরে পড়ে থাকি। তৃষ্ণা লাগলে নিঃশব্দে চুমুক দেই পানির গ্লাসে। যেন সময়ের গল্প বলায় ব্যাঘাত না ঘটে। সময় আমাকে টেনে নিয়ে যায় এখানে-সেখানে। কখনো হেঁটে, দৌড়ে, সাইকেলে, হুড খোলা রিকশায়, ট্রেনে, বাসে বা প্লেনে। না যেতে চাইলে কলার চেপে, টেনে হিচড়ে নিয়ে যায়। দাঁড় করিয়ে দেয় নিজের মুখোমুখি। প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে। আমার উত্তর দিতে ভালো লাগে না। ছোটবেলায় ক্লাসে প্রশ্ন করলে শিক্ষক খুশি হতেন ভালো প্রশ্ন করার জন্য। বলতেন, প্রশ্ন করাটাই বড় ব্যাপার। সব প্রশ্নের উত্তর না জানলেও চলে। আমিও তাই সময়ের প্রশ্ন শুনে যাই। উত্তর না জানলেও চলে।

সময় বলে চলে সময়ের মত। আমি ঘোর লাগা, তন্দ্রাহীন মানুষের মত শুনে যাই। গল্পের অনেক কিছুই আমার জানা, অনেক চরিত্রের সাথেই আমার পরিচয় ছিল। একসাথে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে চা খেয়েছি, ভাগাভাগি করেছি রিকশার সিট। কিন্তু আজ চেহারাগুলো ঝাপসা লাগে, অচেনা মনে হয়। সময় থামে না। তার গল্প বলায় ক্লান্তি লাগে না। সে যেন সদ্য কলেজে ওঠা কিশোরী অথবা রিটায়ার্ড সরকারি চাকুরে। এদের মত সময়েরও গল্প বলায় ক্লান্তি নেই। এভাবে ভাবলেশহীনভাবে কিভাবে সময় গল্প বলে কে জানে? সে উত্তরের তোয়াক্কা করে না। তার যেন কিছুতেই কিছু যায় আসে না।

আমার ব্যক্তিগত সময় থেমে আছে। আমি এই গল্পবাজ সময়ের সাথে উৎসবে মত্ত। আমার ব্যক্তিগত সময় শুণ্য। যেন আমি এখনো জন্মাইনি।

যাপন করেছি অন্যের জীবন। নিজের কোনো অস্তিত্বই নেই। তাহলে সময় কার গল্প বলছে? আমাকেই বা কেন বেছে নিয়েছে শ্রোতা হিসেবে? এসব কি সত্যিই ঘটেছিল কলেজে, ক্যান্টিনে, লাইব্রেরিতে, বইয়ের পাতায়, কবিতার খাতায়, রাস্তায়, সাইকেলে, রিক্সায়, ফুটপাতে, চা-সিংগাড়ায়, দুধে-ভাতে, কাদা -পানিতে, জুতা - মোজায়, কাঁচা বাজারে, মাংসের দোকানে, আচারে- চাটনিতে। এগুলো কি আমারই গল্প? সময় কি সব সময়ই আমার সাথে ছিল? লিখে রেখেছে ফেলে আসা দিনপঞ্জি। কিভাবে সে জানে মনের গভীরের কথা, ঘটতে পারতো এমন ঘটনা। সময় ভোলেনি কিছুই। যা কিছু ঘটেছে, যা কিছু ঘটেনি, যা কিছু ঘটতে পারতো। বাদ দেয়নি কিছুই। যা কিছু আমি দেখেছি, যা কিছু ছিল আমার দৃষ্টির আড়ালে। কিছুই সময়ের নজর এড়ায়নি। সময় যেন সদ্য কলেজে ওঠা কিশোরী। পাশে বসা ছেলেটার নিঃশ্বাসের শব্দ ও গুণেগুণে মনে রাখে। নয়ত রিটায়ার্ড সরকারি চাকুরে, পেনশনের টাকায় বাড়ি করছে। প্রতিটা ইট - বালির হিসেব মুখস্ত করে বসে আছে।

আমার শহর বড় বেশি নির্জন, নিঃশব্দ। সময়ের প্রতিটা নিঃশ্বাস আমি শুনতে পাই। আমি লাল নকশী কাঁথার নিচে পড়ে থাকি। আমার সময় স্থির। শুধু ঘড়ির কাটারা এগিয়ে যায়।

-করোনা কালের জীবন, কোলন, জার্মানী।

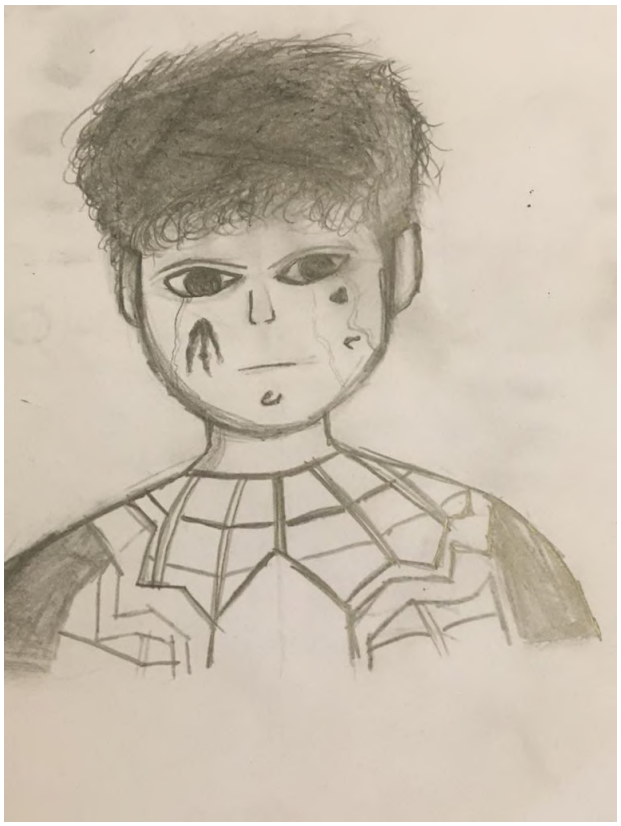

স্কেচঃ বাবুই

বন্ধু

তৌহিদ আমানুল্লাহ

বন্ধু কি?
বন্ধু মানে দিশাহীন পথে হঠাৎ আশার বাণী।
বন্ধু হলো ভরসা আনি।
বন্ধু হলো আপন ভুবনের প্রজাবিহীন রাজা-রানী।

বন্ধু হলো স্বচ্ছ শিশিরে সরলে সরলে মেলা
বন্ধু হলো অভিমানের মেঘ কাটিয়ে ভাসিয়ে ভেলা।
বন্ধু মানে মুক্ত আকাশে মিষ্টি রোদের ঝোলা।
বন্ধু মানে নবান্নের উঠানে, শস্য ভরা গোলা।

বন্ধু হলো সকাল
বন্ধুত্বে নেই কোন বিকাল।
বন্ধু মানে দুরন্ত দুপুর
বন্ধু মানে মিষ্টি রোদের ঝলকানো পুকুর।

বন্ধু মানে ভোরের আলো
বন্ধু তাই মুছে দেয় সব কালো।
বন্ধুত্বে আছে অনুপ্রেরণা, নেই করুণা।

বন্ধু মানে নদী,
বন্ধু যেন উৎস থেকে সমুদ্রে পথ চলা মোদী ।
বন্ধু হলো অবারিত জলরাশির প্রাকৃতিক শব্দে ঝর্ণা।
বন্ধু মানে কখনো দূর্বার গতির আঁকাবাঁকা বর্ণা।
বন্ধু মানে দামাল ছেলের ঝাপ,
বন্ধু হলো বিপদে-আপদে নেই কোন পরিমাপ।
বন্ধু মানে গাঙচিলের ন্যায় সরব কলরব,
বন্ধু তাই বিশাল জলরাশিতে স্রোতের গরব।
বন্ধু মানে নদীর জলে রবির কিরণে-
চিকচিক আলোক বাতি।
বন্ধু তাই চঞ্চল ও গতি।

বন্ধু হলো স্বচ্ছ জল
বন্ধুত্বে আপন প্রতিচ্ছবি কল।
বন্ধু মানে পর্বত রূপী ঢাল
বন্ধু তোমায় দেখে আঁখিতে ছলছল
বন্ধু হলো অম্লান তারুণ্যের বল।
বন্ধু মানে সন্ধ্যা প্রদীপ ন্যায় দিশা,
বন্ধু তাই অন্ধকারের ভরসা
বন্ধুই আমার ভালোবাসা।

বন্ধু হলো দুঃসময়ের কষ্টি পাথরের আশার আঁশ,
বন্ধু তাই শত বেদনায় প্রশান্তির শ্বাস ।
বন্ধু আমার শক্তি, শান্তির পরশ,
বন্ধু আমার প্রেরণায় সরস ।
বন্ধু মানে হাতে-হাত ধরে বন্ধুর পথ পেরিয়ে চলা।
বন্ধুত্বে তাই নেই কোন ছলাকলা।

বন্ধু বলা তো সহজ এবং আমরা বলি
বন্ধুত্বের সময়ে না ফোঁটা ফুলের কলি।
বন্ধু যদি হও, বন্ধুত্ব ধারণ করো বিশ্বাসে,
বন্ধু যদি হও, অনুধাবন তব হৃদয়ে নিশ্বাসে।

বন্ধু আমার ভরসা।
বন্ধু তোদের বলতে চাই আমিও আশা।
বন্ধু মানে একটি প্রতিজ্ঞা ‘পাশেই আছি’।
বন্ধু তোদের অনেক ভালোবাসি।

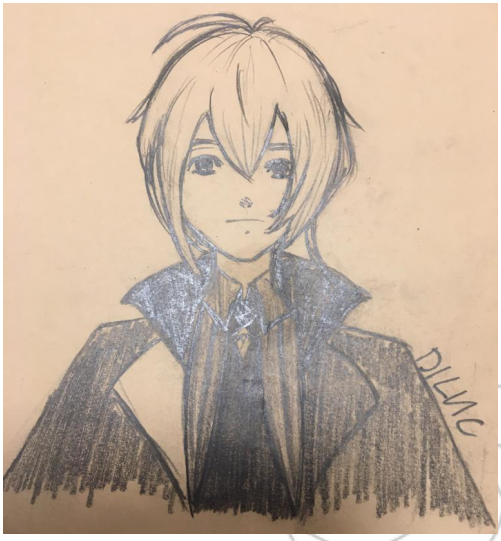

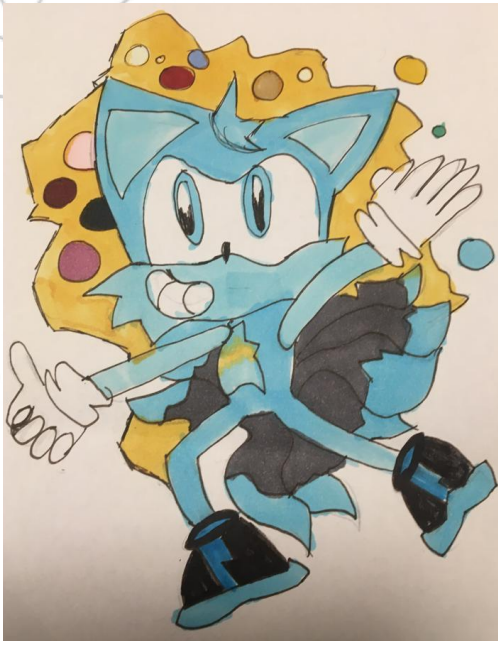

স্কেচসমূহঃ বাবুই

সখী, ভালবাসা কারে কয়?

অতল সাহা

ভালবাসা! আহা! কী মধুর এক শব্দ! 'আমি তোমাকে ভালবাসি'- বাক্যখানা আমরা সকলেই জীবনের কোনো না কোনো এক সময় শ্রবণ করিয়া ও করাইয়া থাকি। ইহা বড়ই এক সৌন্দর্য, আর ইহ বস্তুখানি হৃদপিন্ডসহ সমগ্র শরীরের জন্যই উপাদেয়। কিন্তু কখনো কখনো ইহ ভালোবাসা এমন কিছু ব্যামোর ব্যুৎপত্তি করিয়া থাকে যাহার উপসর্গ উপলব্ধি হইলেও উপশম প্রাপ্তি দুস্কর! এই যেমন উঠন্ত যুবক-যুবতীরা অনিদ্রা, ক্ষুধামন্দা, দিবাস্বপ্ন, mobile ম্যানিয়া, ফেসবুকিয়া ইত্যাদি ইত্যাদি অলক্ষণ প্রদর্শন করিয়া থাকে, যাহা দৃষ্টিগোচর হইলেও ব্যামোর নাম তদুপরি তাহার ঔষধের নাম অধরাই থাকে। রাম! রাম!

সে যাহাই হউক, গুরুজনেরা সর্বদা বলিয়া থাকেন যে 'বাছা, অন্যকে ভালোবাসিতে হইলে অগ্রে নিজেকে ভালোবাসো!' গুরুবাক্য শিরোধার্য করিয়া সকলেই আমরা নিজেকে ভালোবাসি, বড্ড ভালোবাসি! আম্রবাগান-জাম্রবাগান-অলির মোড়-গলির মোড় আর ফেসবুকের দেওয়ালে দন্ডায়মান থাকিয়া, পিতৃদেবের পকেট উজার করিয়া আর মাতৃদেবীর নজর এড়াইয়া এক সময় প্রিয় মানুষটিকেও ভালোবাসি! অতঃপর সুখে শান্তিতে বসবাস করিতে থাকি! মধু! মধু! কিন্তু মায়ার এই জগতে সকল মানব-মানবীর এমন 'অতঃপর তাহারা সুখে শান্তিতে বসবাস করিতে থাকিল' পরিণতি হইলো কবে?

প্রিয় মানুষটিকে প্রাপ্তির পরক্ষণেই আমরা নিজের চাহিদা, ভালোলাগা আর না লাগার লম্বা ফর্দ হাতে ধরাইয়া দিয়া থাকি। আর সেই ফর্দের ভারে মানুষটি জীবিত থাকিয়াও একসময় মরিয়া যায়, আমাদের অগোচরেই। প্রশ্ন হইলো যে, যখন প্রিয় মানুষটিকে সর্বতভাবে কেবল আমার নিজস্ব চাহিদার ভিত্তিতে সাজাইতে যাই; তখন কি উহা তাহা হাইলে ভালোবাস হইলো? নাকি উহা কেবল স্বার্থপরতা?

তবে আসুন সুধী! লক্ষ্য করি- প্রিয় মানুষটিকে ভালোবাসছি তো? নাকি নাম ভাঙ্গাইয়া নিজেকেই ভালোবাসছি :)

প্রেমময় হউক সকলের জীবন! :)

স্কেচঃ স্মারক রায়

The Streets and Architecture of Bucharest: A Photo Diary of Perfect Mixture

Shaurav Paul

Bucharest, the capital of Romania, is one of the most under-rated capitals of Europe. People call it "Little Paris" sometimes for its vibrant and energetic cityscape. As an architect and traveler, I always prefer to explore a city from the gradual change of political landscape and its effect on building structures and infrastructures. As the title suggests, Bucharest is a perfect mixture of different architectural styles, which were juxtaposed in this landscape through the change of political and business endeavors.

After the fall of its communist regime in 1989, the city started to welcome modernism at a fast pace. The cityscape is the perfect witness of change of the ruling landscape and the development pattern of city infrastructure. In a walking tour, I tried to capture the most significant architectural structures and the vives of the vibrant city. The cityscape of Bucharest consists of Brancovian style, Neo-Romanian style, Art Deco, Communist-era style and the latest trend of modernism. Bucharest is also called the city of heaviest buildings because of its connected, wall shared and symmetric mono-styled structures.

1. The Palace of Parliament

The Palace of the Parliament (Palatul Parlamentului) is the house of the parliament members in Romania, which is the heaviest building in the world and also the second-largest in ground coverage. This modernist Neo-classical architectural marvel was designed and constructed from 1984 to 1997 and it became the most expensive administrative building in the world.

2. **Central University Library**

The central library of the University of Bucharest was built in 1893, which was the place of wisdom since its opening. It holds a lot of historic writings and manuscripts along with a regular book collection. In the time of the Romanian Revolution in 1989, it was burnt with 500,000 books and 3700 manuscripts. After this devastation, it was renovated and opened again in 2001.

3. **Cărturești Carusel**

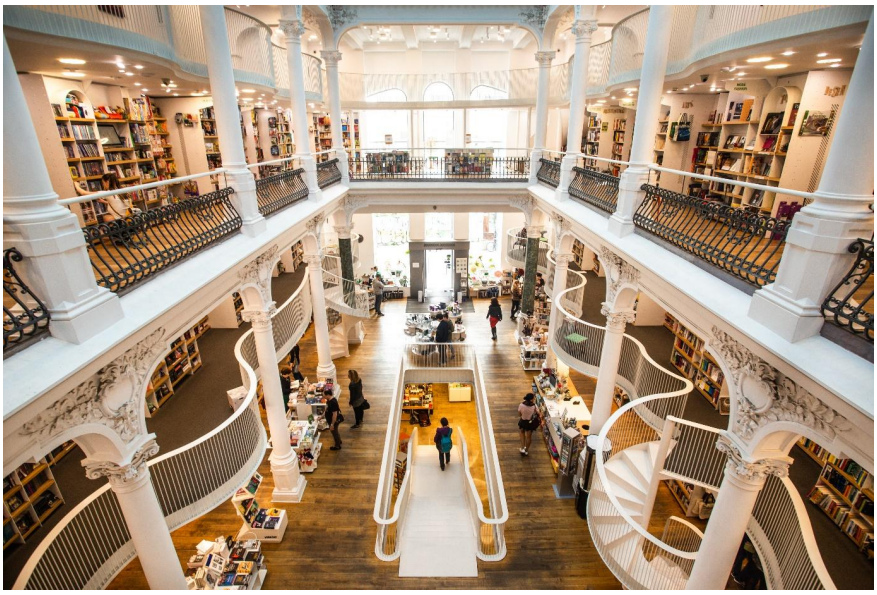

Cărturești Carousel or "Carousel of Light" is one of the most beautiful bookstores in the world. This building was made in 1903 as a stationery shop but renovated and decorated as this bookshop in 2007. A lot of tourists come to Bucharest just to visit this elegant bookshop every year. The curved balconies, open middle space and coffee shop at the top create an amazing environment for the book lovers as well as the general visitors.

4. Old Town

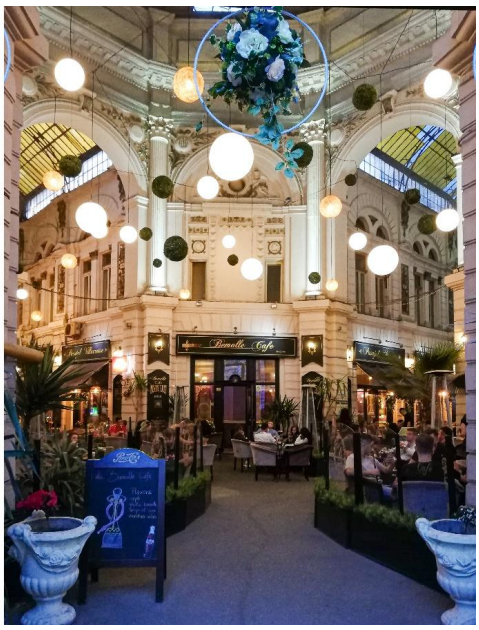

The old town of Bucharest is the most attractive place in the city. This area is covered with cobbled stone and lined with old buildings with transformed & renovated ground space. This whole old town is full of amazing cafes, coffee shops, beer gardens, restaurants, casinos, souvenir shops and ice-cream parlors. Amazing street singers performed whole night at the weekends and visitors were amazed by the vibrant lights and ambience.

(Source: Wikipedia and lonelyplanet.com)

এইটুকু ফাঁক থাকা ভালো

মিঠুন কুমার সমাদ্দার

তাই ফাঁক রেখো এভাবে-কর্মে মর্মে।
গোধূলিবেলার বিটপীর সারি।
জলাবদ্ধ পাড়ের প্রতিবেশী আলো।
আমার তৃষ্ণা ও কামনার পৌনপনিকতা।
ঝড়ের আভাস পেয়ে নিজস্ব শামুক শক্তকরণের ক্লাস।
আমার গোলাপ বেলা।
তাই এভাবে ফাঁক রেখো- জলে স্থলে।
আমি যেন পারি প্রিয়তমা কোলের আস্থা হতে।
প্রিয় হাসিমুখ যেন খসে পড়ে না যায়।
আমার স্বাভাবিক দেবী যেন নিজ আসনে অপমানিত না হয় আর।
দূরত্ব কিছু রেখো রণে বনে এবং জঙ্গলে।
লবঙ্গ লতার মত ছন্দবদ্ধ বাহু নিয়ে আমরণ চিৎকার।
আমার স্বভাব বিরোধী বাতাস।
নিজস্বতা হারানোর প্রহর।
আমাকে সুস্থ রেখো প্রিয় অসুখে।
তব পদে বিনীত প্রার্থনা।

জার্মানিতে বরিশালের ঐতিহ্যবাহী পানীয় "মলিদা"

জামিল শুভ

জীবনের পঁচিশটা রোজার ঈদের সকাল শুরু হয়েছে বরিশালের বিশেষ পানীয় "মলিদা" দিয়ে। তারপরে পরিপাটী হয়ে এক গাল সেমাই খেয়ে ঈদগাহ ময়দানে গমন। ঈদ সবার জন্যই অন্য রকম এক আনন্দের দিন হলেও আমার মত বরিহাইল্লা মনুদের জন্য এই বিশেষ পানীয় পানের এক সুযোগ। জার্মানিতে এসে অনেক কিছু রান্না করা শিখে যেতে বাধ্য হলেও এই দুঃসাধ্য সাধন করার সুযোগ হয়েছে সেই ঈদের দিনেই। যেহেতু এখানে ভালো নারকেল মেলা দুষ্কর, তাই সেই মায়ের হাতের সাধ না হলেও ভিনদেশী বন্ধুরা পর্যন্ত "মলিদা" খেয়ে অবাক হয়েছিলো। যদি আপনি এখন পর্যন্ত কখনো এই জিনিসের সাক্ষাৎ না পেয়ে থাকেন তাহলে নিচের তৈরি প্রক্রিয়া দেখে এই অমৃতের সাধ নিয়ে নিতে পারেন অনায়াসে--

উপকরণ:

১-কাপ পোলাওয়ের চাল বাটা

২-টেবিল চামচ নারিকেল বাটা

১/২-কাপ ভিজিয়ে রাখা চিড়া

২-কাপ ঠান্ডা তরল দুধ

১-কাপ ডাবের পানি (এখানে পাইনি)

১-চা চামচ আদা বাটা

১/২-কাপ চিনি

এবং লবণ পরিমাণ মতো।

প্রস্তুত প্রণালি:

একটি পাত্রে প্রথমে পোলাওয়ের চাল বাটা, নারিকেল বাটা ও চিড়া মিশিয়ে হাত দিয়ে ভালো করে কঁচলে নিন, যেন সবগুলো উপাদান একসাথে মিশে যায়। আরেকটি পাত্রে গরুর দুধ, ডাবের পানি ও চিনি মিশিয়ে সম্পূর্ণরূপে চিনি না মিশে যাওয়া পর্যন্ত নাড়তে থাকুন।

দুধের মিশ্রণে চাল, নারিকেল ও চিড়ার মিশ্রণটি অল্প অল্প করে মিশিয়ে নাড়তে থাকুন। সবগুলো মিশ্রণ ঢালার পর লবণ ও আদা বাটা দিয়ে ৫ মিনিট ভালো করে নাড়ুন। চাইলে ব্লেন্ডারেও ব্লেন্ড করে তৈরি করে নিতে পারেন। এবার পছন্দ মতো গ্লাসে ঢেলে সাজিয়ে পরিবেশন করুন সুস্বাদু মলিদা।

তুই আমার আরেক মেয়ে

Dr Nazmul Siddique

আপেল গাছটি বাগানের পুবকোণে
বছর কয়েক ডালপালা মেলে বড় হয়েছে।
দেখতে বেঢক-
ফল হয় খেতে টক।
সুন্দর বাগান, অসুন্দর গাছটা!
কেটে ফেলবো-
উদ্ধত হই দা নিয়ে - ধারালো দা।
আঘাত করতেই,
মনে পড়ে মায়ের বারণ
'ফলবন্ত গাছ কাটে না'
ফিরে আসি, বছর গড়ায়।

করোনার ভয়ে ঘরে বন্দী,
দু'মাস হোলো
বাইরে গ্রীষ্ম - মাতাল বাতাস!
বাগানের গাছগুলো
রুপে রুপে ফেটে পড়ছে,
হেসে হেসে এদিক ওদিক ঢলে পড়ছে।
এসে দাঁড়াই বাগানের কোণায়।
গাছ ভরে ফুল এসেছে আপেল গাছটায়,
কাছে যেতেই সে লজ্জায় ছোট হয়ে
চুপেচুপে বললো,
'এবার দেখ, আপেল হবে লাল টুকটুকে'।

শিউরে উঠি নিষ্ঠুর আমি,
কেটে ফেলতে চেয়েছিলাম ওকে!
ভারি অন্যায়-
কেঁদে উঠল সারা মন।
গাছটা কে জড়িয়ে ধরি,
আমি কাঁদছি
দুটো ফুল পড়লো মাথায়
গাছটাও কাঁদছে
অন্যায় করেছি

তুই থাকবি এই বাগানে
তিন মেয়ে আছে আমার এই বাড়ীতে
ওদের সাথে তুই আমার আরেক মেয়ে ।

চলে যাবে সবাই একদিন
তুই থাকবি এই বাড়ীতে,
ভুলে যাসনে তোর ঠিকানা
ফয়েল নদীর কোল ঘেঁসে
দোতালা বাড়ী
উনচল্লিশ নম্বর বাটলারস ওয়ারফ
লন্ডনডেরী শহর,
আমার কথা বলিস সবাইকে
তুই আমার আরেক মেয়ে
একশ বছর পরে।

লন্ডনডেরী, ১৮ মে ২০২০

শহুরে সবুজ বাসে জীবনের প্রতিচ্ছবি - প্রেক্ষাপট ইউরোপের দিনকাল

সৌরভ দাস

কি-বোর্ডের অক্ষরে এখন যা লিখব, সেটি নিছক গল্প নয়, আমার প্রবাস জীবনের নিত্য উপলব্ধি ও একজন সুনাগরিকীয় দর্শন। বিশ্বাস করুন, কলমের কালিতে রুপকার্থে জীবনের দর্শনগুলো ফুটিয়ে তুলতে আমি যে সব সময় অপারগ তার বড় প্রমাণ: শিক্ষা জীবনের প্রাপ্ত মূল্যায়ন আর আজ অবধি কোনো প্রাতিষ্ঠানিক মলাটে নিজের লেখনী প্রকাশের ভীতি। তাইতো, KUinEU ব্যানারে লেখনীর এমন সুযোগ আমার জন্য অনুপ্রেরণীয় পথ চলা।

বিশিষ্টজনের ভাষায়, 'গণ-পরিবহণ একটি দেশের প্রকৃত প্রতিচ্ছবি'। সত্যি বলতে, দেশের মাটিতে থাকাকালীন বিষয়টির সুদৃঢ় তাৎপর্য কখনো আমার চিন্তার উপজীব্য ছিল না বা কিভাবে একটি 'সাধারণ বাস' দৈনিক সংগ্রামী জীবনের সামষ্ঠিক প্রতিচ্ছবি হতে পারে বিষয়টি বোধ করি আমার মত আমজনতার চিন্তার খোরক হতে পারেনি। তবে প্রবাস জীবনের স্বচ্ছ মূল্যায়ন আমি দারুণভাবে উপলদ্ধি করছি।

.....ঘটনায় আসা যাক, ইউরোপের দেশ সুইডেনের একটি অতি পরিচিত শহর 'লুন্ড'- এ গল্প দর্শনের মূল কেন্দ্রভূমি। শহরে কেন্দ্রস্থলে ভ্রমণ বা নিজ গন্তব্যস্থলে গমনের জন্য সব থেকে জনপ্রিয় বাহন হল 'সবুজ বাস'। আর এখন যে ঘটনাগুলো সাক্ষী হিসাবে উপস্থাপন করব, তা সবুজ বাসে মঞ্চস্থ আমার নিত্যদিনের সাক্ষ্য থেকে সংগৃহিত।

পূঙ্গী (১)..

শুরু করি আমার ভাষায় 'এরা বোকা নাকি'। মাফ করবেন 'বাঙালীদেরকে' না 'সুইডিশদের' উদ্দেশ্যে বলছি। স্বাভাবিকভাবে গণ-পরিবহণে বিনা টিকিটে ভ্রমণ আমাদের শুধু যে অভ্যাসই না বরং সস্তা জনপ্রিয়তার নিয়মিত গল্প। টিকিট চেকারকে কিভাবে ফাঁকি দেওয়া যায় এ নিয়ে কতশত পরিকল্পনা থাকে আমাদের দৈনিক কার্যতালিকায়। এমন পরিবেশে মানিয়ে নেয়া কাউকে যদি বলা হয়, এ শহরের গণ- পরিবহণে আমাদের দেশের মত চেকার নাই, আছে শুধু কয়েকটি যন্ত্র- যা আপনার স্পর্শকে সবুজ আলোয় অভিবাদন করে। ভাবুন তো, এমন পরিস্থিতিতে আপনি কি ভাববেন -থাক, উত্তরটা নিজের কাছেই রাখুন। কারণ আপনি যা ভাবছেন, হয়তবা আমিও তাই-ই ভাবছি। ৬ মাসের প্রবাস জীবনে, আজ পর্যন্ত কোন সাদা বা কালো রং এর কোন ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করেনি, 'টিকেট প্লিজ '। কি আজব আস্থা সুইডিশ সরকারের এদেশে বসবাসরত সাধারণ মানুষের ওপর।

আসুন বাস ভ্রমণে সাধারণ সুইডিশদের একটু আচরণ জানার চেষ্টা করি- সব বয়সের যাত্রীরা বাসে ওঠা মাত্র স্বেচ্ছায় কাল বিলম্ব না করে বাসে থাকা যন্ত্র মানবের সবুজ স্পর্শের মাধ্যমে নিজেদের উপস্থিতি নিশ্চিত করেন। আসলে সবুজ স্পর্শটি হল 'ডিজিটাল বাস টিকিট' যেটি আপনি অবশ্যই বিভিন্ন মেয়াদে ক্রয় করবেন। বাস চালক তার নিজস্ব চেম্বারে বসে আপন কাজ করেন এবং আমার বিশ্বাস তিনি মনে করেন, 'তার বাসের প্রত্যেকটি যাত্রী সঠিক নিয়ম অনুসরণ করছে'। সত্যকথা বলতে, অদ্যাবধি আমার চোখে চালকের এ নিত্য বিশ্বাসের যে খুব ব্যতিক্রম দেখেছি বলে মনে হয়নি।

নিয়ম, আস্থা এবং সততা মনে হয় এদের নিত্য জীবনের অলংঙ্কার। আসলেই সুইডিশরা বোকা! এমন সুযোগের যথাযথ ব্যবহার কিভাবে করতে হয় এরা জানে না...!!! তবে, ব্যক্তি হিসাবে জন্মভূমিতে এমন পরিস্থিতিতে কি করতাম তা বোধকরি এখন না বলতে পারলেও, লুন্ড শহরে আসার প্রথম দিন থেকে একজন সুনাগরিকের সকল ধর্ম পালন করার চেষ্টা করছি। কেন এই 'আয়নাবাজী'- বিদেশী ভয় নাকি পরিবেশ আমাকে

অনুপ্রাণিত করেছে এমন সৎ হতে- উত্তরটা এখনও খুঁজছি আমি।

পূঞ্জী (২)..

বরাবর পত্রিকা বা মিডিয়ার পাতায় আমার অবাধ বিচরণ। সে প্রেক্ষাপটে আমার একটি উপলব্ধি হলো, 'দেশে স্বঘোষিত বিশেষজ্ঞের কোন অভাব নেই'। যেমন সকালে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে দেখবেন- কেউ বলছে 'এ দেশের উন্নয়ন এখন বিশ্বকে শেখায়, ইউরোপ/আমেরিকা থেকে আমরা কম যাই কি' আরোও কত কি..! দেশব্যাপী এ বিশেষজ্ঞ মহলের চক্রে পড়ে নিরীহ আমজনতার নাভিশ্বাস যে চরমে উঠেছে তার খবর কে রাখে!! প্রসঙ্গক্রমে, কয়েকশত কোটি টাকা ব্যয়ে সদ্য নির্মিত খুলনা রেলওয়ে স্টেশনে যাত্রি বিড়ম্বনার একটা উদাহারণ দেওয়া যাক। নির্মিত প্লাটফর্ম ও ট্রেনের প্রবেশের মধ্যে উচ্চতার দুরত্ব এতটাই যে, একজন স্বাভাবিক যাত্রির পক্ষেও প্লাটফর্ম থেকে ট্রেনে প্রবেশ করা আমার মতে একটি অসাধরণ দক্ষতার সামীল। আর মাঝবয়েসি, শারিরীক প্রতিবন্ধি, শিশু, অসুস্থ শ্রেনীর যাত্রীর কথা আলাদা করে নাই বা বললাম। শুনেছি হাজারো অভিযোগের ফলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্লাটফরম পুনর্নির্মানের। প্রশ্ন হল- প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয়, বাস্তবায়ন বা মূল্যায়নের সময় স্বঘোষিত বিশেষজ্ঞরা কি ধরে নিয়েছিল 'প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সময়কালের মধ্যে বাংলাদেশের সাধারন মানুষের গড় উচ্চতা বেড়ে যাবে বা সাধারণ যাত্রিরা বিশেষ দক্ষতা অর্জন করে এখন থেকে ট্রেন ভ্রমন করবেন...!!। উত্তরটি কি কখনও পাব এ প্রশ্ন মনে।

...বলছি সুইডেনের কথা, মশাই এর মধ্যে খুলনা কোথা থেকে এল.....তাহলে আবার ফিরে আসি সবুজ বাসে। বাসটির ভিতরকার কাঠামোগত দিকগুলো একটু নিবিড়ভাবে দেখলেই মেলে উত্তম পরিকল্পনার ছোঁয়া। সকল শ্রেনীর যাত্রীর সুবিধার কথা বিবেচনা করে বাসে সিটগুলোর বিন্যাস করা হয়েছে। হোক সে- হুইল চেয়ারের প্রতিবন্ধী, মায়ের সাথে থাকা ১ বছরের শিশু কিংবা ৮০ বছরের বৃদ্ধা-বৃদ্ধ - সবার জন্য সবুজ বাসে আছে আরামদায়ক ও গ্রহণযোগ্য সিট বিন্যাসের ব্যবস্থা। ভাবছেন- এটা খুব ব্যয়বহুল? তথ্য মতে বাংলাদেশের সাথে ইউনিট ভিত্তিক খরচ তুলনা করলে, আমার বিশ্বাস ইউরোপ পিছিয়ে থাকবে। সুতরাং, সকল পর্যায়ে দক্ষতা পরিমাপে উত্তম পেশাদারিত্ব ও সময়পযোগী সিদ্ধান্ত না থাকলে এমন স্বঘোষিত বিশেষজ্ঞের পরিকল্পনাহীন উন্নয়ন বোধ করি আমাদের জন্মভূমিতে চলতেই থাকবে।

পূঞ্জী (৩)..

'মহিলার জন্য সংরক্ষিত আসনে বসে থাকা, বাসের মধ্যে উচ্চস্বরে গল্পের তুবড়ি ফাটানো, সুযোগ বুঝে পুরষত্ব প্রদর্শণ, মোবাইলের লাউড স্পিকারে বাড়ির হাঁড়ির গল্প বাস সমেত যাত্রিদের -কে ফ্রি-তে শোনানো, আরোও কত কি... এটা কি বিনোদন বা Public Nuisance এর বিডি ভার্সন বলবেন? তবে, সুইডেনের পাবলিক বাসে এমন রসালো নাট্য না থাকায় বলতে পারেন প্রথম কিছু দিন আমি 'Cultural Shocked' ই পেয়েছি। বাস ভর্তি মানুষ কিন্তু কেউ কোন কথা বলে না; মনে হয় সবাই কথা ভুলে গেছে। হুম, বলছি ইউরোপের গণ-পরিবহণের শালিনতার কথা, যেখানে প্রধান উপকরণই হল- 'আমি যেন অন্য কারোর বিরক্তের কারণ না হই'। কি ভাই আপনি-ই বলেন, কথা না বলে কি থাকা যায়- চুলায় যাক এমন শালিনতা। অভ্যাসের কথা চলবেই 'আন-লিমিটেড টক টাইম'।

ইংরেজি সাহিত্যে একটি বিশেষ জনপ্রিয় মতবাদ 'The Texas Sharpshooter Fallacy' যার মূল্য প্রতিপাদ্য হল- আমি যেটা বিশ্বাস করি বা বলি, তা বাস্তবায়নের জন্য যা করার তা করি, হোক তা সহস্র প্রাণের বিড়ম্বনা । আমরা যে এই প্রতিপাদ্যের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসরে অনুসারি - সেখানে কোন দ্বিধা নেই। গ্রহণযোগ্য বৈশ্বয়িক শিক্ষা সময়ের আবেদন হলেও, আমরা নিজ অবস্থানের পরিবর্তনে খুবই নিরাশাবাদী। তাইতো, বৈদেশিক শিক্ষার প্রভাব এয়ারপোর্টের ইমিগ্রেশন

পার হতেই ধূসর হয়ে যায়। এ পরিস্থিতে, অনুসারি হবো নাকি অনুকরণীয় হবো- এটাই বড় প্রশ্ন। যা বলতে চাই একটি সবুজ বাসের রুপে, জানিনা বলতে পেরেছি কিনা। তবে, 'গণ-পরিবহন' যে একটি জাতির মনন, চিন্তা, প্রাত্যহিক জীবনের ধরন এবং বিশ্বাসের প্রতিফলন- এ প্রতিপাদ্যে আমি পরিশেষে একমত।

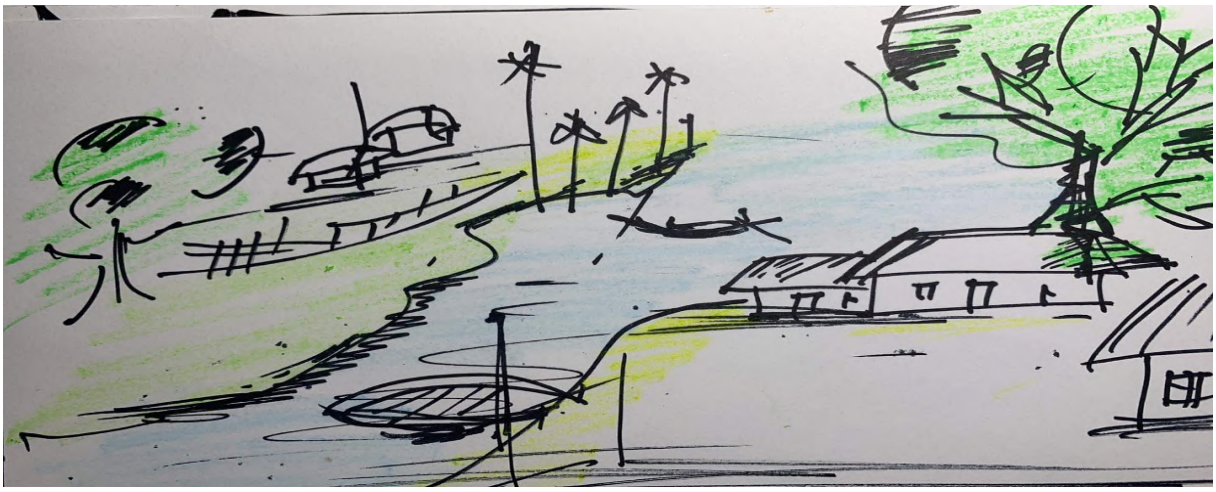

কানাইনগর

বিশ্বজিৎ মল্লিক (শুভ)

বৈশাখের দাবদাহে - পশুর নদীর তীরে,
জোয়ারের আশে - নুড়ি কুঁড়ানো সেই কাদামাটির খেলা ।
হাতে ধরি - ভেজা মাটির লুকোচুরি -
সিক্ত পলির আস্তরণে চরণচিহ্ন,
আত্মহারা উল্লাসে সুহাসিনীর মুখোচ্ছবি -
পুষ্করিণীর জলে সমর্পিত কাদাময় লজ্জা।
পিপাসিত বক্ষে -
ময়লাবিহীন পল্লীর রৌদ্রমেলায়
দুটি প্রাণের মোটরযাত্রায় সাক্ষী শুধু -
বৈশাখী দুপুর
ঝিমিয়ে পড়া, ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত বৃক্ষকুলের বিবর্ণ আচ্ছাদন।
কানাইনগর,
তোমার গাছের তপ্ত শীতল ছায়ায়
পশুরের ভাটির টানে - হৃদয়ে জোয়ার এসেছিল।
বুকের জমিনে পুঁতেছিলেম ক্ষয়িষ্ণু বৃক্ষের বীজ।
ডাল পালা গজিয়ে-
সে বৃক্ষ আজ- নিজের ছায়ায় নিজেই হারায়,
তারই ডালে ডালে বাসা বাঁধে অতিথি পাখি।
সময় ও স্রোতের টানে-
তারা উড়ে যায়-
ফিরে এসে - আবার উড়ে যায়-
এক অসীমের মোহনায়-
অন্য ভুবনে-অন্য বৈশাখে-অন্য দাবদাহে ।
কানাইনগর,
তোমার স্মৃতির মুগ্ধতায়-
সূর্যের প্রতীক্ষায় নয়,
দিনের উজ্জ্বলতায় নয়,
শুধু চন্দ্রিমা জোছনা রুপালি মূর্ছনায়-
শহরের অন্ধকারে- হাজার বাতির ভিড়ে-
ছুঁয়ে থাকা সময় শুধু তোমায় খুঁজে ফেরে-
খুঁজে যায়।

স্বপ্নভঙ্গের টুকরো স্মৃতি

সৈয়দ মোর্শেদ কামাল

পত্রমিতালী

ক্লাস নাইনে পড়ি। হঠাৎ ফুপুর বাসায় একটি ম্যাগাজিনে পত্রমিতালী বলে একটি জিনিষ আবিষ্কার করলাম- পত্রমিতালী করতে ইচ্ছুক অনেক ছেলেমেয়ের নাম-ঠিকানা দেয়া আছে! মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি! কয়েকটি ঠিকানা (অবশ্যই মেয়েদের) টুকে নিয়ে বাড়ী ফিরলাম। ফিরলাম বললে ভুল হবে- উড়ে আসলাম; আর যে দেরী সয় না। দরজা বন্ধ করে একজনকে একটি চিঠি লিখলাম-নারায়ণগঞ্জে থাকে। খামে ভরে, ঠিকানা লিখে সব রেডি- এখন শুধু পোস্ট অফিসে যাব, পাঠাবো আর রাজ্য জয় করব- উফ্‌ফ্‌। খামে ভরা চিঠি বুক শেলফে বইয়ের ভিতর লুকিয়ে রাখলাম, কাল স্কুল থেকে ফিরেই পোস্ট অফিসে যাব। চিঠি স্কুলে নিলাম না, যদি বন্ধুরা দেখে ফেলে! আরও কেউ যদি চিঠি লিখে ফেলে!
স্কুল থেকে বাসায় ফিরে দৌড়ে শেলফের কাছে গেলাম, বই হাত দিতেই একটু খটকা লাগল, বইয়ের ভিতর আমার অমূল্য চিঠিটি নেই! টের পেলাম পেছনে কেউ দাঁড়িয়ে- মা! বাম হাতে আমার চিঠি আর ডান হাতে ডাল ঘুঁটনি। আমার ঘর গুছাতে এসে আমার অমূল্য স্বপ্নখণ্ডটি তার হাতে পড়ে।

শাস্তির দ্বিতীয় পর্ব হিসাবে পরদিন বিকেলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাজারে গেলাম নতুন ডাল ঘুঁটনি কিনে আনতে...

পৃথিবী জানতেও পারল না কি অসাধারণ একটি পত্রমিতালীর (সম্ভাব্য) অপমৃত্যু ঘটলো!!!

উড়ু মন

তখন আমি ক্লাস টেনে। রোমান্টিক মন আমার। একে কি বেঁধে রাখা যায়! এদিক-ওদিক তাকাতে ভালো লাগে, কেউ একটু মিষ্টি করে হাসলে ভালো লাগে, ক্রিকেট খেলতে গেলে আসেপাশের বারান্দা-জানালা দিয়ে কেউ তাকিয়ে থাকলে নিজেকে হিরো মনে হয়। সেই সময় পাশের বাড়ীতে এক নতুন পরিবার এলো, দু'বোন- তানিয়া আর মুনিয়া। তানিয়া বড়, মুনিয়া ছোট। জানলাম তানিয়া ক্লাস টেনে পড়ে আর মুনিয়া সেভেনে, আইডিয়াল স্কুলে। তানিয়া চুপচাপ, মুনিয়া চঞ্চল। ওদের বাসার সামনের ফাঁকা জায়গায় ব্যাডমিন্টন খেলি, মাঝে মাঝে তানিয়া এসে বারান্দা থেকে উঁকি মারে। আমার জীবন পুরোই এলোমেলো!
এইবার আর চিঠির ভুল করা যাবেনা, অনেক বেশী সাবধান হতে হবে! একদিন তানিয়াকে দেখলাম ছাদে উঠেছে। কিছু ভাবের আদান-প্রদানের এই তো সুযোগ। দৌড়ে বন্ধু মাসুদকে নিয়ে ওদের ছাদে উঠলাম। মাসুদদের বাসা

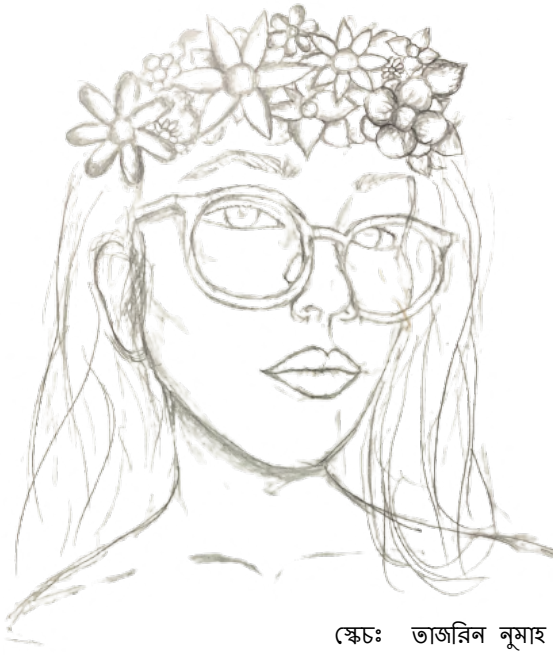

স্কেচঃ তাজরিন নুমাহ

আমাদের বাসার বাম পাশে, অর্থাৎ তানিয়াদের বাসা আর মাসুদদের বাসার মাঝখানে আমাদের বাসা। ইশারা ইংগিতে কিছুটা ভাব (মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ সেঞ্চুরি করলে গ্যালারির বিশেষ একজনকে উদ্দেশ্য করে যা করে, সেরকম কিছু আরকি) আর হাসি বিনিময় হচ্ছিল।

একবার বেশী আবেগ তাড়িত হয়ে দু'হাত তুলে নাড়ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম আমাদের বাসার ছাদ থেকেও একজন হাত নাড়ছে! একি! বাবা! অফিসে না থাকার কথা!

আমাদের বিল্ডিং এর কাজ চলছিল। বাবা কনট্রাক্টরকে সাথে নিয়ে কাজ দেখতে উপরে উঠেছেন। আমার হাত নাড়া দেখে ভেবেছেন আমি হাত নেড়ে তাকে ডাকছি। তাই বাবা হাত নেড়ে সাড়া দিচ্ছিলেন। এই পর্যন্ত সব ঠিক ছিল। কিন্তু বাবার কেন যেন সন্দেহ হলো। পিছন দিকে ফিরলেন, তানিয়াদের বাড়ীর দিকে তাকালেন। বুঝলেন পুত্রের ভালোবাসা পিতার দিকে ধাবিত হয়নি, ভালোবাসা বাউন্স করে অন্য বিল্ডিং এ যেয়ে আছড়ে পড়ছে। সে রাতে আর বাড়ীতে ঢুকবার সুযোগ হয়নি। আর পরবর্তীতে আমার উপর কি চিকিৎসা হয়েছিল তা বলতে চাচ্ছি না.....বুঝে নেয়াটা বোধ হয় তেমন কঠিনও না...

পা ধোয়া পানি

আমার জীবনের আরও একটি বড় ট্র্যাজেডি হল- নেহাল থেরাপি। আমি আর আমার চাচাতো ভাই নেহাল একই ক্লাসে পরতাম। আমি মতিঝিল গর্ভনমেন্ট স্কুলে আর নেহাল গর্ভনমেন্ট ল্যাবে। দু'জনের হোম টিউটরও একই- রবীন্দ্র স্যার।কার কি রেজাল্ট হল সব সময় তার চুলচেরা বিশ্লেষণ! কলেজে এসে আরও বড় বিপদ- দু'জনেই ঢাকা কলেজে। তবে স্কুল আর কলেজ জীবনের ঘটনায় বিস্তর ফারাক। সেটায় পরে আসছি।

স্কুলে নেহাল সিরিয়াস ছাত্র। পরীক্ষায় বরাবর ভালো রেজাল্ট করে, ফাইভ- এইটে বৃত্তি পায়। স্যার নেহালকে পড়িয়ে আমাকে পড়াতে আসেন। প্রতিদিনই নেহাল কত ভালোভাবে পড়ালেখা করে তার জ্ঞান নিই। পড়ালেখায় জ্ঞানী না হলেও আমি নেহাল বিষয়ে প্রতিদিন বাবা-মা আর স্যার এর কাছ থেকে শুনে মহাজ্ঞানী হয়ে উঠলাম। প্রায়ই যে বিখ্যাত ডায়লগটা শুনতাম তা হল- "তোমার প্রতিদিন নেহালের পা ধোওয়া পানি খাওয়া উচিত। তাতেও যদি কোন উন্নতি হয়!" আমি জানি, আমার টাইপ যারা, তারা জীবনের কোন না কোন সময় পা ধোওয়া পানি খাওয়ার পরামর্শ অবশ্যই পেয়েছেন। যাই হোক, উন্নতির কোন লক্ষণ না দেখে বাবা-মা হাল ছেড়ে দিলেন। আমি নিশ্চিত বাবা নেহালের পা ধোওয়া পানি জোগাড় করে ফেলতেন, শুধু চাচার কারণে হয়তো সম্ভব হয়নি! এবার আসি কলেজ পর্বে, আমি-নেহাল দু'জনেই ঢাকা কলেজে। আমি আগে থেকেই ছেড়ে দেয়া মুরগী আর নেহাল জীবনের প্রথম খোঁয়াড় থেকে বের হওয়া মুরগী। ও যা দেখে তাতেই ওর মাথা আউলা-ঝাউলা। নিউ মার্কেটে যায়, ইডেন কলেজে যায়। শুরুতেই সিগারেট, এরপর আরও কিছু। আমার অতি কড়া চাচী কিছু বুঝে উঠার আগেই পরিস্থিতি অনেক দূর... সেগুলো বলা যাবে না।

কারও পৌষ মাস, কারও সর্বনাশ। এই ঘটনায় আমার একটা লাভ হল- পা ধোওয়া পানি তত্ত্ব থেকে মুক্তি পেলাম।

আর্মি অফিসার

ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময় মনে হলো আর্মিতে যেতে হবে। খুব তাড়াতাড়ি প্রতিষ্ঠিত হওয়া যাবে। অতি উৎসাহের কারণটা এখানে নাই বলি! যেই ভাবা, সেই কাজ। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার পর কয়েক বন্ধু মিলে আর্মিতে ভর্তি পরীক্ষা দেয়ার ফর্ম নিয়ে আসলাম। যথারীতি প্রাথমিক বাছাই পরীক্ষা দেয়ার চিঠি পেলাম। উত্তেজনায় থরো থরো অবস্থা। বাসায় নিজেকে মেজর সাহেব আর ভাই-বোনদের সৈনিক ভাবা শুরু করে দিলাম!

পরীক্ষার দিন খুব সকালে যেয়ে ক্যান্টনমেন্টে হাজির। একে একে সবাইকে ভিতরে ঢুকালো। প্রথমে কয়েকজন এসে সবার কাগজপত্র পরীক্ষা করলেন। এরপর একে একে প্রাথমিক মেডিক্যাল পরীক্ষা হবে। শেষ পর্যন্ত আমার পালা এল। পরীক্ষার বিস্তারিত বিবরণ দিচ্ছি না- খুবই বিব্রতকর!

এক সময় সবার মেডিক্যাল পরীক্ষা দেওয়া শেষ হলো। এইবার ফলাফল দেবার পালা। যারা পাশ করবে তারা একই দিনেই রিটেন পরীক্ষা দিবে। টান টান উত্তেজনা। একে একে উত্তীর্ণদের নাম ঘোষণা হচ্ছে। যারা উত্তীর্ণ হচ্ছে তারা যেয়ে রুমের আর এক পাশে দাঁড়াচ্ছে (যেভাবে হিন্দি সিনেমায় দেখায়)। এক সময় দেখলাম নাম ঘোষণা করা শেষ। আমি একা এক পাশে দাঁড়িয়ে আর বাকি সবাই আর এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ করে চোখের ভিতর কিছু একটা পড়লো। মুখটাকে সবার কাছ থেকে আড়াল করে মাথা নিচু করে বেরিয়ে এলাম। আমার পায়ের পাতা নাকি সমতল, যাকে বলে ফ্ল্যাটফুট। ফ্ল্যাটফুট হলে আর্মিতে চাকরির সুযোগ নেই। আরও একটি অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি হলো। দেশ ও জাতি একজন মেধাবী অফিসারের সেবা থেকে বঞ্চিত হলো!

পাদটীকা-

আমার গল্পগুলো কেউ সিরিয়াসলি নিবেন না। কারণ, আমি মোটেও সিরিয়াস মানুষ নই।
আমার গল্পগুলো শুনে কিছু জিনিষ আপনাদের মনে হতে পারে; যেমন- আমার মা-বাবা খুব কড়া টাইপের মানুষ, অথবা আমি একজন হতাশাগ্রস্থ মানুষ। আসলে তা নয়। আমার বাবা-মা, বিশেষ করে আমার বাবা যে কি অসাধারণ এক মানুষ সে গল্প আর একদিন বলবো (যদি সুযোগ পাই)। আমি হতাশ টাইপ মানুষও না। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আশাবাদী। আমার না পাওয়ার চেয়ে পাওয়ার তালিকা অনেক দীর্ঘ। আনন্দের কাব্য অন্য একদিন বলবো।

সঙ্গত কারণে প্রতিটি চরিত্রের নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। ঘটনাক্রমে কারো জীবনের সাথে মিলে গেলে লেখক দায়ী নন।

মানুষ

তৌহিদ আমানুল্লাহ

তুমি কি মানুষ !
নাকি ফানুস !
নাকি ফানুসরূপী মানুষের অবয়ব !
না তুমি মানুষরূপী অবয়বে -পিশাচ !

নাকি মোমের অন্ধত্বে
পিচাশের বন্ধুত্বে
বিলিন, মনুষ্য অস্তিত্বে ?

পশু-পাখিরও ধর্ম আছে ।
আছে ভালোবাসা, আছে রীতিনীতি।
মায়ের কোলের ন্যায় আগলিয়ে রাখে, বিশাল প্রকৃতি।

যার ধর্ম, তার কাছে।
মানো কি না মানো,
জানো কি না জানো।
মানুষ সত্য, পৃথিবী সত্য।
সত্য মানবতা।
মনুষ্যত্ব কে নিয়েই তবে মানুষ।

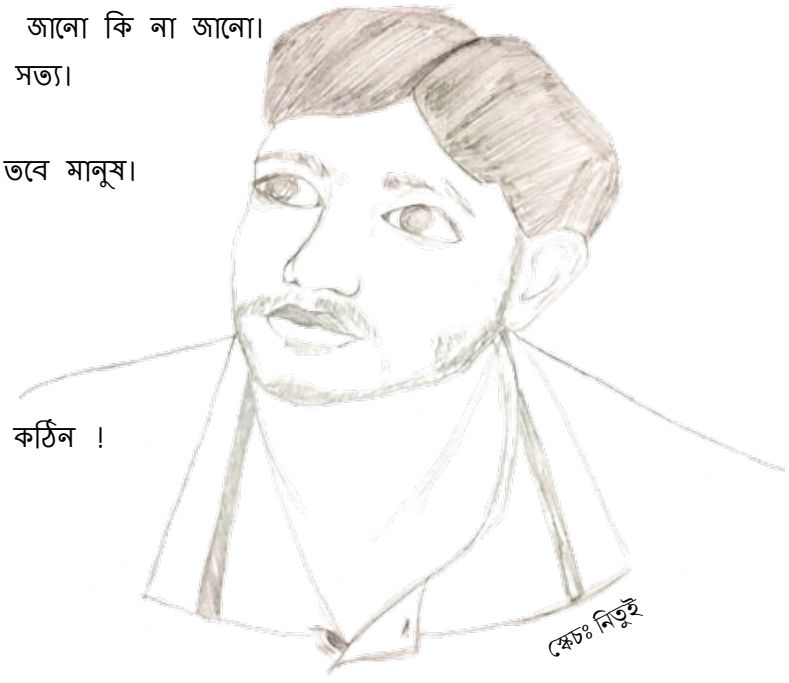

মানবতা কাঁদে ,
মনুষ্যত্বের নিষ্ঠুর বধে
মানুষ হওয়া কি সাধে ?

মানুষ হওয়া কি খুব কঠিন !

শক্ত হাতে ধরি,
বিশ্বাস বুকে বাঁধি।
মনুষত্বের বন্ধনে-
এসো মানবতা গড়ি

স্কেচঃ তাজরিন নুমাহ

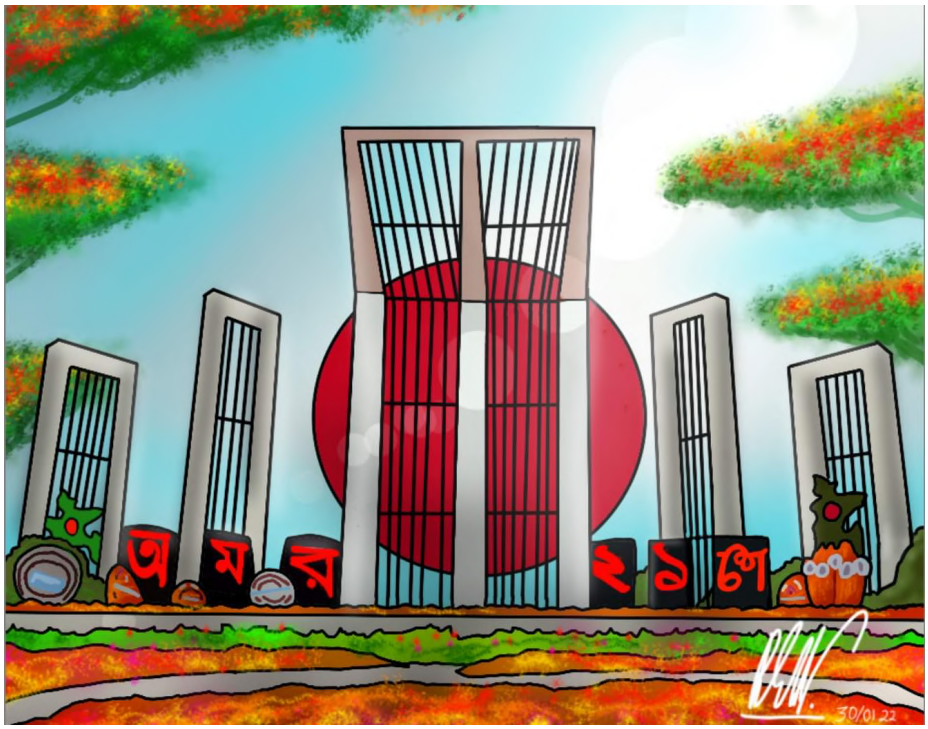

ডিজিটাল আর্টঃ রায়দুর রাহমান

Covid-19 ব্যবস্থাপনা- ভাবতে হবে নতুন করে।

গাজী মহিউদ্দিন

২০১৯ সালের শেষের দিকে আবির্ভূত হওয়া করোনা ভাইরাসের তাণ্ডবে সারা দুনিয়া আজ লন্ডভন্ড। মহামারির দ্বিতীয় ঢেউয়ের ধাক্কায় নাকাল অবস্থা বাংলাদেশ, ভারত, ব্রাজিল সহ বিশ্বের নানা প্রান্তে। প্রতিদিন শনাক্ত হচ্ছে লক্ষ লক্ষ নতুন রোগী আর সেইসাথে পাল্লা দিয়ে প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে বিশ্বব্যাপী মৃত্যুর সংখ্যা। এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বিজ্ঞানীরা দিনরাত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন; কেউবা কার্যকরী ভ্যাকসিন আবিষ্কারে ব্যস্ত আবার কেউবা কাজ করে যাচ্ছেন এই ভাইরাস নিয়ন্ত্রণের জন্য সঠিক চিকিৎসা ব্যবস্থা নিরূপণে। কিন্তু এ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে তারা কিছুটা সফল হলেও পুরোপুরি সফলতা পাচ্ছেন না। কারণ এই ভাইরাসটি ক্রমাগত জিনোম পরিবর্তন করে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ধরণ বা স্ট্রেইনের আবির্ভাব ঘটাচ্ছে।

যে কোন ভাইরাসের রূপ পরিবর্তন বা বিজ্ঞানের ভাষায় Genetic Mutation খুবই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, যার সুফল এবং কুফল দুটো দিকই রয়েছে। কিছু কিছু মিউটেশনের ফলে ভাইরাস দুর্বল হয়ে পড়লেও অনেক ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন ভাইরাসকে আরো বিপজ্জনক করে তোলে, যা Covid-19 এর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে করোনাভাইরাস এর নতুন ধরনগুলোর মধ্যে যুক্তরাজ্য, ব্রাজিল, সাউথ-আফ্রিকান Variant এবং অতি সম্প্রতি ভারতে আবির্ভূত হওয়া B.1.618 Variant খুবই উল্লেখযোগ্য। এই নতুন Variant গুলো পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী এবং দ্রুত সংক্রমণে সক্ষম। প্রচলিত স্বাস্থ্যবিধি এবং বাজারে আশার আলো নিয়ে আসা বিশ্ব বিখ্যাত বিভিন্ন কোম্পানির Vaccine সমূহ এই Variant গুলোর বিরুদ্ধে পুরোপুরি সুরক্ষা দিতে পারবে কিনা- সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীরা যখন এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে ব্যস্ত ঠিক তখনি গত সপ্তাহে New York থেকে প্রকাশিত The Lancet journal এর একটি রিপোর্ট এতদিন ধরে করোনা ব্যবস্থাপনার বিশ্বব্যাপী প্রচলিত মত, বিশ্বাসের সকল ধারণা বদলে দিয়েছে।

The Lancet চিকিৎসা বিজ্ঞানের বাইবেল হিসেবে খ্যাত অত্যন্ত হাই ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর (৬০+) জার্নাল যেখান থেকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং ইউনিসেফসহ বহু আন্তর্জাতিক সংস্থা তথ্য-উপাত্ত ডাটা রেফারেন্স হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। 2020 সালের গোড়ার দিকে এই জার্নালে কয়েকজন বিশ্ব বিখ্যাত বিজ্ঞানী (যাদের মধ্যে নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানীও ছিলেন) বলেছিলেন মহামারী ঠেকানোর জন্য বর্তমানে সারা বিশ্বে প্রচলিত লকডাউন পদ্ধতি সঠিক সমাধান নয় এবং সম্ভবত করোনা মহামারী ঠেকানোর জন্য অদূর ভবিষ্যতে এটা একটা ভুল পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তাদের সেই ধারণাকে সঠিক প্রমাণ করে দিয়ে গত সপ্তাহে ল্যানসেট জার্নাল এই নতুন রিপোর্ট প্রকাশ করে যেখানে বিশ্বের অনেক নামিদামি বিজ্ঞানীরা লিখেছেন করোনা বা Covid-19 Virus টি এখন Airborne হয়ে গিয়েছে। যার মানে হলো আপনি শুধুমাত্র ঘরে আবদ্ধ থেকে এই ভাইরাস থেকে আর সুরক্ষা পাবেন না বরং ঘরের চাইতে বাইরে মুক্ত বাতাসে ঘুরে বেড়ানো অনেক বেশি নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত। তারা মানুষ এবং প্রাণী দেহের উপর বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন রোগীর হাঁচি-কাশি বা রোগীর সাথে সংস্পর্শের মাধ্যমে এ রোগ যতটা না ছড়ায় তার চাইতে রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে নির্গত ভাইরাসের মাধ্যমে এ রোগ অনেক বেশি ছড়ায়। তারা বলেছেন কোন আবদ্ধ স্থানে যদি কিছু লোক অবস্থান করে এবং সেখানে একজন উপসর্গবিহীন রোগীও থাকে, তবে তার শ্বাস-প্রশ্বাসে নির্গত

ভাইরাস সেখানে অবস্থানরত সবাইকে সংক্রমিত করতে পারে কারণ সেখানে ভাইরাসের ঘনত্ব অনেক বেশি। বরং আপনি যদি ঘরের সব দরজা জানালা খুলে দেন তবে ভাইরাসের ঘনত্ব অনেক কমে যাবে এবং আপনার সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনাও কমে আসবে। একইভাবে আপনি আবদ্ধ ঘরে বন্দি না থেকে (যেটা লকডাউন এর মাধ্যমে মানুষকে করা হয়ে থাকে) বাইরে মুক্ত বাতাসে ঘুরে বেড়ান যেখানে লোকজনের উপস্থিতি একটু কম সেটা আপনার জন্য অনেক বেশি উপকারী। এমনকি তারা এটাও বলছেন আবদ্ধ ঘরে বন্দি না থেকে স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি এবং শপিংমলে ঘুরে বেড়ানোও অনেক ভালো। কারণ, সেখানে ভাইরাসের ঘনত্ব বাতাসে ছড়িয়ে পড়ার মাধ্যমে অনেক কমে যায় যেটা আপনাকে সংক্রমণের ঝুঁকি থেকে বাঁচিয়ে দেয়।

সুতরাং করোনা মহামারী থেকে বাঁচার জন্য নতুন করে ভাবার সময় এসেছে। এতদিন ধরে প্রচলিত স্বাস্থ্যবিধি যা মানুষকে শুধুমাত্র ঘরে বসে থাকার জন্য উদ্বুদ্ধ করে যেটা আসলে বাস্তবসম্মত নয়। উদাহরণ হিসাবে আমরা বলতে পারি আমরা যারা সুইডেনে বসবাস করি তারা দেখেছি প্রথম থেকেই সুইডিশ সরকার মানুষকে ঘরে বন্দি করে রাখেনি; বরং বাচ্চাদের কিন্ডারগার্টেন, স্কুল, কলেজ এবং শপিংমল, রেস্টুরেন্ট সহ সবকিছুই উন্মুক্ত রেখেছে, মানুষকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলাফেরা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে যার ফলস্বরূপ সুইডেনের করোনা মহামারীর প্রকোপ ইউরোপের অনেক দেশের চাইতে কম। এই ভাইরাসটি যেভাবে প্রতিনিয়ত তার রূপ বদলাচ্ছে এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে নতুন নতুন ভেরিয়েন্ট এর আবির্ভাব ঘটাচ্ছে, যেটা বিশ্বব্যাপী ভাইরোলজিস্টদের ঘুম হারাম করে দিয়েছে। তারা সবাই দিনরাত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন কিভাবে আরো বেশী কার্যকরী ভ্যাকসিন তৈরি করা যায় এবং সাথে সাথে এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে কার্যকরী সঠিক চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার করা যায়। কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে এই ভাইরাসের আবির্ভূত হওয়া নতুন নতুন ভেরিয়েন্ট সেই সম্ভাবনাকে অনেক বেশি দুরূহ করে তুলছে এবং সারা পৃথিবী আবার কখন এই মহামারী থেকে পরিপূর্ণ মুক্ত হয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে সেটা কেউই নিশ্চিত করে বলতে পারছে না।

গত কয়েকমাস যাবত আমি স্টকহোমে অবস্থিত Karolinska University Hospital এ Corona Virus নিয়ে গবেষণা করছি। আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা থেকে এটা বলতে পারি হয়তো আগামী কয়েক বছর আমাদেরকে এই করোনার সাথে বসবাস করতে হতে পারে, এবং এ যুদ্ধ মোকাবেলায় আমাদের সবার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। সুতরাং আমাদের সবার উচিত করোনার বাস্তবতা উপলব্ধি করে The Lancet এ প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে বাস্তব শিক্ষা গ্রহণ করে নতুনভাবে পথ চলতে শুরু করা, করোনার ভয়ে ঘরে বসে না থেকে সকল প্রকার স্বাস্থ্যবিধি মেনে যতদূর সম্ভব লোকজনের আধিক্য পরিহার করে মুক্ত বাতাসে বেরিয়ে পড়া, ধীরে ধীরে নিজ নিজ কর্মস্থলে ফিরে যাওয়া এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার চেষ্টা করা, এটাই এখন সময়ের একমাত্র চাহিদা।

গত বছর নভেম্বরে করোনার নতুন ধরণ অমিক্রণ শনাক্তের পর গত চার মাসে সারাবিশ্বে তেরো কোটি মানুষের করোনা শনাক্ত হয়েছে, এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে এর মধ্যে ৫ লক্ষাধিক মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছে। গুরুতর অসুস্থতা কম হলেও অধিকাংশ মানুষ টিকা গ্রহণ করার পরেও ৫ লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যু খুবই উদ্বেগজনক বিষয়।

তবে আশার কথা হচ্ছে বিশ্বব্যাপী গবেষকেরা ইঙ্গিত দিচ্ছেন অমিক্রণ প্রবল সংক্রমণের ফলে ইউরোপ-আমেরিকার শতকরা ৬০ ভাগ এর উপর মানুষ মার্চ মার্চের মধ্যে করোনা সংক্রমিত হতে পারে। পর্যাপ্ত টিকা গ্রহণ এবং অধিক হারে সংক্রমিত হওয়ার কারণে মানুষের শরীরে করোনা

প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যাবে, এবং বহুল প্রতীক্ষিত হার্ড ইমিউনিটির প্রভাবে করোনা মহামারী শেষ হতে পারে।

তবে যেমনটি বলছিলাম, আমাদের করোনা নিয়ে অধিক আতঙ্কিত না হয়ে প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে হবে। প্রয়োজনে সবাইকে টিকার চতুর্থ ডোজ নিতে হবে, কারণ প্রতিটা ডোজ টিকা নেওয়ার পর শরীরে উৎপন্ন হওয়া এন্টিবডি করোনার নতুন ধরনের বিরুদ্ধে বেশিদিন কার্যকর থাকে না। তাই টিকার প্রতিটি নতুন ডোজ আমাদের শরীরে করোনার নির্দিষ্ট ভেরিয়েন্ট এর বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। করোনা গবেষণার একজন ক্ষুদ্র সদস্য হিসেবে আমি আশা করি যে সকল প্রকার স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে অধিক সংখ্যক মানুষের প্রয়োজনীয় সংখ্যক টিকা গ্রহণের মধ্য দিয়ে অচিরেই করোনা ভাইরাস স্থানীয় বা মৌসুমী সাধারণ ভাইরাল ফ্লুতে রূপান্তরিত হবে, যেটা এই মুহূর্তে আমাদের সবার একান্ত প্রত্যাশা।

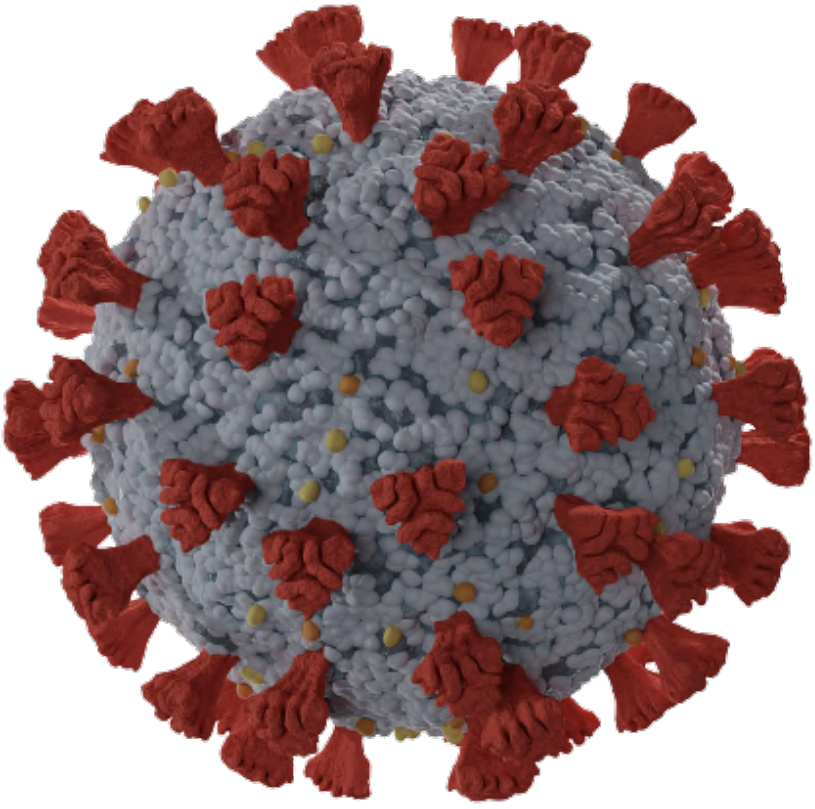

©forbes.com

এক সুপ্ত লালিত স্বপ্নের পথ চলা শুরু...

শাহী মোঃ তানভীর আলম

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় (খুবি) এর প্রাক্তন গ্রাজুয়েটগণ অনেকদিন ধরেই একটি স্বপ্ন লালন করে আসছিল- কিছু একটা করবার- হোক না সেটা কোনো ছোট ব্যবসা বা কোনো পরামর্শক প্রতিষ্ঠান যাতে করে গ্রাজুয়েটগণের ভ্রাতৃত্ব আরো অটুট করা, অপরদিকে সুদূরে প্রবাসে থেকে দেশের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করা। কি করা যায়- কিভাবে করা যায়...!!! অনেক আলোচনা- অনেক সমালোচনা-অনেক যুক্তি- অনেক বুদ্ধি। কিন্তু কিছু শুরু করতে গেলে তো একটা ব্যবসায়িক সনদ প্রয়োজন। কোথায় হবে সে সনদ নেবার স্থান বা কে-ই বা নিবে সে দায়িত্ব সনদ করবার..!!! অবশেষে সকল জল্পনা-কল্পনা পেরিয়ে গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখ ইংল্যান্ডের শেয়ার বাজারে 'KU IN EU LIMITED' নামে একটি প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু করেছে এবং ১০ ইউরো মূল্যমানের ১ (এক) লক্ষ শেয়ার বিক্রয় করবার জন্য অনুমোদন পেয়েছে। ইতোমধ্যে লিমিটেড কোম্পানীর নামে ইংল্যান্ডে একটি ব্যাংক হিসাবও চালু করা হয়েছে।

CERTIFICATE OF INCORPORATION OF A PRIVATE LIMITED COMPANY

Company Number **13912886**

The Registrar of Companies for England and Wales, hereby certifies that

KU IN EU LIMITED

is this day incorporated under the Companies Act 2006 as a private company, that the company is limited by shares, and the situation of its registered office is in England and Wales.

Given at Companies House, Cardiff, on **14th February 2022**.

The above information was communicated by electronic means and authenticated by the Registrar of Companies under section 1115 of the Companies Act 2006

Companies House

THE OFFICIAL SEAL OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

KUinEu reunion 2021

জামিল শুভ এবং মুমু

আমরা খুবিয়ানরা যে কোন মুহূর্তে যে কোন পরিবেশে নিজেদেরকে এক অবিচ্ছেদ্য পরিবার বানিয়ে ফেলতে পারদর্শী। আমাদের বিশেষত্ব হচ্ছে যে আমরা সবসময় আমাদের হাজার রঙ্গের জীবনের সাথে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি আলাদা স্বত্বা মনে করি। স্বস্তির জায়গা বা ইংরেজিতে "Comfort zone" বলতে যা বোঝায়, এই প্রবাস জীবনে একজন খুবির ভাই-বন্ধুর দেখা মেলা হচ্ছে তাই। অনেকদিন ধরেই কথা চলছিলো ইউরোপের কোথাও সাময়িক সময় এর জন্য খাজার মাঠ বানানো যায় কিনা, আর তারই দায়িত্ব নিয়ে বসলেন শুভ দাদা (নগ্রাপ' ৯৪)। ইউরোপের অন্যতম সুন্দর শহর জার্মানির ড্রেসডেনকে ঠিক করা হল প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর একদল উৎফুল্ল মানুষের মিলনস্থল হিসেবে।

১৪ আগস্ট কে সামনে রেখে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে শুরু হয় সবার এই স্মৃতিময় স্বপ্নভ্রমণ। পৃথিবীর এই অসুস্থ সময় এবং বিভিন্ন বাধ্য বাধকতায় আটকা পরে শেষ মুহূর্তে এসে অনেকে জানিয়ে দিলেন যে তারা আগামী পুনর্মিলনীতে এসে জমিয়ে দিতে চান, এবারে সম্ভব হচ্ছে না। এই কারনে হঠাৎ করে অঙ্গহানির মত এক অজানা অনুভূতি শুরু হলেও আগত সকলের আন্তরিকতা এবং বাচ্চা কাচ্ছাদের হাঁকডাকে নিমিষেই ড্রেসডেন হয়ে উঠতে শুরু করে একখণ্ড খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়।

কল্পনার বাইরে সব আয়োজন দিয়ে সিক্ত করতে শুরু করলেন ড্রেসডেনে বসবাসরত সকল আয়োজকবৃন্দ। মধ্য ইউরোপের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ

নদী এল্বের (Elbe) পারে গোধূলির আলোয় এক কোপ বিরিয়ানি মেরে শুরু হয় আসল গল্প। সবাই বলছিল বিরিয়ানি নাকি সিদ্ধ হয়নি ঠিক ভাবে তাই তারা খেতে পারছেন না, কিন্তু এই বলতে বলতেই দুই ডেক কখন যে সাবার করে দিয়েছে তা কেউ টের পায়নি। বিখ্যাত গান “কইলজা কাইটা দিলেও কইবে লবন কম হইছে” টাইপ অবস্থায় পরে গিয়েছিলেন মাস্টার সেফ শুভ দাদা এবং তার সাথে সকল বিশেষ রাঁধুনিগণ।

যে বিরিয়ানিতে লবণ কম

সবাই যদি একসাথে না থাকতে পারে তাহলে তো আর সেই ক্যাম্পাসের হলের ভাবটা আসবে না, তাই আগে থেকেই সবার থাকার যায়গা ঠিক করা ছিল এক কমন হোটেলে। আমাজন থেকে নিয়ে আসা এক Smoky যাদু দিয়ে (এটা নিয়ে জানতে হলে শুভ দাদার সাথে একান্তে কথা বলার অনুরোধ থাকলো) হোটেলের সামনে সাজিয়ে রাখা চেয়ার টেবিল নিমিষেই খাজার উদাম খোলা মাঠ বানিয়ে ফেলেছিল সবাই। পুরনো দিনের গল্প, সকল স্মৃতির ঝুলি, হাঁসি, ঠাট্টা এবং এক পূর্ণতার আনন্দে মুহূর্তেই সবাই ডুবে যায় সেই রাত জাগা আড্ডায়। আসল পুনর্মিলনীর অনুভবটা শুরু হয় যখন সবাই সাড়ে চার হাজার মাইল দূর থেকে প্রিন্ট হয়ে আসা KUinEu এর গেঞ্জিটা পরে একসাথে বের হল, ভাবতেই ভালো লাগছিলো যে জার্মানিতে ঐদিন একটি বাস ছুটে চলেছিল একদল একই পরিচয়ের মানুষ নিয়ে এক অসম্ভব সুন্দর গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ৫৬২ মিটার উপরে মুক্ত বাতাস যতটা না বিশুদ্ধ হওয়া সম্ভব তারথেকেও অনেক বেশী আবেগের মনে হচ্ছিলো শুধু মাত্র ঐসময়ে উপস্থিত সবার প্রফুল্লতার জন্য, এটি জার্মানির একটি অন্যতম প্রসিদ্ধ দর্শনীয় স্থান যেখানে সব সময় বিভিন্ন দেশি বিদেশী পর্যটকের ভিড় লেগেই থাকে তার অপরূপ সৌন্দর্যের কারণে। সুইজারল্যান্ড এর পর্বতমালার সাথে এই পর্বতমালার এক গভীর মিল দেখিয়ে বিভিন্ন সময় গুণীজনরা একে "Saxony Switzerland" বলে বিভিন্ন যায়গায় উল্লেখ করায় কালক্রমে মানুষ একে এখন জার্মানির সুইজারল্যান্ড বলে সম্বোধন করতে শুরু করে দিয়েছে।

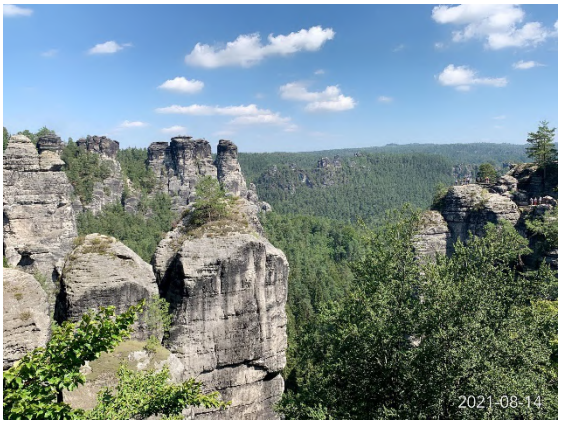

নদী এল্বের (Elbe) সাথে জনপদ আর শুভ্র সবুজে ঘেরা পাহাড়ের এক প্যানোরামা দৃশ্য যে কোন কঠিন ব্যক্তির মনও মুহূর্তেই শীতল করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট, আর তার সাথে যদি থাকে সেই হাজার পুরনো গল্প তাহলে আর কি চাই। ঐ সময়ে একটা তপনদার ঝুপড়ী আর চায়ের কাপের গরম ধুঁয়া যদি একবার কেউ পেত, আমি হলপ করে বলতে পারি আমাদের সবাই বাড়ি ফেরার কথাটাই হয়তো ভুলে যেত ওখানে। কিন্তু ক্ষুধা লাগলে মানুষ নতুন বউ রেখেও খাদ্যের খোজে বের হয়, তাই এই প্রকৃতির মোহ কেটে আসতে আসতে সবার নজর যেতে শুরু করে এবার আয়োজকদের দিকে। এবার তাহলে কি খাওয়া দাওয়া হবে!! ওখান থেকে ফিরে এসে শুরু হয় মাংস পোড়ানোর আয়োজন সাথে চলতে থাকে সবার জন্য বাবস্থা করা বিভিন্ন খেলাধুলার সম্ভার।

“ও গাজী আর কতক্ষণ?”-রবিন ভাই

কাউকে কোনোদিন দেখেছেন মুখে লাগানোর মাস্ক চোখের উপরে দিয়ে হারি ভাঙ্গা খেলতে? কি? দেখেননি তো তাই না? এটা আমাদের ঐ সময়ে আবিষ্কার করা করোনা বিড়ম্বনাকে বিনোদনে পরিনত করার একটা বড় উপায় ছিল বলতে পারেন। কেউ গানেরকলি দিয়ে মাতাচ্ছিল পুরো ক্যাম্পাস আবার কোথাও চলছিলো বাচ্চাদের ফুটবল ক্রিকেট এবং আরও কতো কি। "কেউ পাবে কেউ পাবেনা, তা হবে না, তা হবে না" নিতিতে বিশ্বাস করে বিচ্ছু বাহিনীর সকল সদস্যকে পুরস্কৃত করা হয়। খাবারের বর্ণনা দিতে গেলে আমার সাহিত্যের বন্যায় পাঠক হারিয়ে যাওয়ার ভয় আছে তাই খুব বেশী কিছু লিখছিনা শুধু এটুকু বলবো যে ড্রেসডেনের ভাই আপু ভাবী বৌদিরা যা করেছে এখনও চোখ মুখ বন্ধ করে

একবার ঢোক গিললে সেই সাধ মনে পরে যাবে অনায়াসে।

উপহার বিতরণ

"বেচারারে আর মাইরেন না"-সুজিত দাদা

সবার বড়ভাই তৌহীদ ভাই সেই সুদূর স্টকহোম থেকে মিষ্টি বয়ে নিয়ে এসেছিল যা চাইলেই ইন্দ্রমোহনের মিষ্টি বলে চালিয়ে দিলেও কেউ ধরতেই পারতো না। কি বলবো লজ্জার কথা, আমি একাই ছয়টা মেরে দিছিলাম আর কি!
শুধু শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শিঙ্গাড়া খাওয়ানোর লোভ দিয়ে গাজী ভাই আর ভাবী আমাদের শেষমেশ কথা রাখেনি ওই বেলায়। অবশ্য কিছু মজার সাথে এই ভাবীর হাতের শিঙ্গাড়া পুরির বেপারটা আগামী বারের জন্য রেখে দেয়াই ভালো, নাহলে গল্প গুলো জোড়া লাগবে কি করে!

মিফতা ভাবী এন্ড কোং

গাজী ভাই এর সুন্দর ভাবে গুছানো সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে স্মৃতিময় একটি দিন শেষ হয়ে আবার সবাই ফিরে আসে সেই আগেরদিন এর খাজার মাঠে। সেখানে এসে শুরু হয় আবার সেই আমাদের মহাকালের সব গল্প, বাপ্পি ভাই খুঁজে পায় শান্তির যায়গা গাজী ভাইয়ের কোল, রবিন ভাই আর রাসেল ভাইয়ের সেন্সর বোর্ডে আঁটকে যাওয়ার মত কিছু স্থির চিত্র, আশিক ভাই এবং সুজিত দাদার দারুন দারুন সব কথা, রিবন ভাই আর সাজ্জাত ভাই সব সময় হয়ে ছিলেন মধ্যমণি।

গাজী ভাইয়ের লজ্জার রহস্য কি..?

আর একটু কম বুড়োদের দলে যেমন আমি (জামিল), মুমু, দেবাশীষ দাদা, আসিফ ভাই এবং তমা আপু এবং জ্যোতির্ময় দাদা আমরা শুরু থেকেই একটা ভঁয়ে ছিলাম যে এতো বড় ভাই আপু কিভাবে যে নিবে আমাদেরকে সেটা নিয়ে, কিন্তু এতো গল্পের পরেকি সেটা আর বলার বাকী থাকে? শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মনে হয়েছে এই সকল মুখগুলো জনম জনম ধরে আমাদের সকলের চেনা, এ যেন এক সম্মান, আদর এবং ভালোবাসায় ভরপুর পরিবার।

আবার এক দীর্ঘ স্মৃতিময় রাত পার করে সকাল সকাল আমরা বেড়িয়ে পরি ড্রেসডেন শহর ঘুরে বেড়াতে, ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা রাজা

বাদশাদের বাড়ি, দর্শনার্থীদের আকর্ষণ করা ধর্মীয় উপসনালয় গুলোর স্থাপত্যশৈলী, অপেরা হাউস, গোল্ডেন হর্সম্যান সহ অসংখ্য নিদর্শন যা এই শহরটিকে সব সময় নিদ্রাহীন করে রাখে।

এর মধ্যে আস্তে আস্তে শুরু হয় অনেকের বিদায়ের পালা, আমরা নাছোড়বান্দা হয়ে বলেছিলাম যে বৌদির হাতের হাঁসের মাংস রান্না না খেয়ে কোন ভাবেই বিদায় নিবো না। যেই কথা সেই কাজ, চলে আশার আগে আবার দেশী খাবারের স্বাদ মুখে নিয়ে মন খারাপ করে বেরিয়ে পরতে হয় নিজেদের গন্তব্যে।

KUinEu এর দ্বিতীয় প্রজন্মকে তাদের অনুভূতি বলার সুযোগ দেয়া হলে ওরা জীবনের অন্যতম সেরা মজার ভ্রমণ হিসেবে এই পুনর্মিলনী আখ্যা দিবে, তাতে কোন সন্দেহ নাই। আমার কাছে মনে হয় আমাদের থেকে ওরা আরও অনেক বেশি উপভোগ করেছে পুরো সময়। আদর্শ অভিভাবকের মতো আগতদের নিতুই এর এগিয়ে নিয়ে আসা, রিবন ভাই এর ছেলে সাফায়েতের এক গেইম খেলার জন্য একা একা বিশাল পথ পাড়ি দিয়ে দাদার বাড়ি হাজির হওয়া, নুমাহ'র জীবনের প্রথম একা একা জার্মানি থেকে ফিরে যেতে হবে জেনেও আনন্দে মেতে ওঠা এমন আরও কতো ঘটনা যে তারা ঘটিয়েছে তা বলে শেষ করা যাবে না। মিরসব, মিশরাক এবং মাহিবা তো আমার আর মুমুর সাথে আমাদের সেই খাজার মাঠে সকাল সকাল উঠে এসে খুব আড্ডা দিয়েছিলো। ভ্রমণ কাহিনী, বাংলাদেশ ভাবনা এবং সুইডিশ ও জার্মান ভাষার গভীর পর্যালোচনাও হয়েছিলো আমাদের আড্ডায়।

ভাবছি, এইসব অনুভূতি কি ছবি বা লেখায় আসলে ধরে রাখা যায়? চাইলেও কি আর ফিরে পাওয়া যাবে সেই ইউরোপে খাজার মাঠ? হয়তো ওভাবে নয় এর থেকে আরও অনেক বেশী রঙে রাঙ্গানো আরও কিছু গল্প পাওয়ার আশা তো করাই যায়, তাই না? খুব তাড়াতাড়ি আমরা আবার এক হতে চাই নতুন আরও অনেক ভাই

আপু এবং তাদের পরিবারকে নিয়ে ইউরোপের কোন এক নতুন শহরে আরও মধুর কিছু স্মৃতি বানাতে।

ড্রেসডেনে যারা কল্পনার বাইরে এমন সুন্দর আয়োজন করেছিলেন, বিভিন্ন দেশ এবং শহর থেকে যারা শত ব্যস্ততার মধ্যেও উপস্থিত হতে পেরেছিলেন, যারা শেষ সময়ে এসে আর যোগ দিতে পারেননি অথবা যারা আগামী গল্পের ভাগীদার হতে চান সবাইকে অনেক অনেক ভালোবাসা এবং শুভেচ্ছা। আশাকরি আগামী পুনর্মিলনী হবে অনুভূত সকল স্মৃতির থেকেও অনেক বেশী আবেগের এবং ভালোবাসার। ভালো থাকুক সকল প্রাণ এবং এভাবেই ভালোবাসায় বন্দী থাকুক আমাদের KUinEu পরিবার।

Program video link:
https://www.facebook.com/jamil.shuvo.140737/videos/528914804997506

কিছু মনে করবেন না, প্লিজ

কিছু টুকরো স্মৃতি

KölnEu
2021-08-14

2021-08-14

এই সংখ্যায় যাদের অবদান অনস্বীকার্য

1. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস রচনা বা একুশে ফেব্রুয়ারি রচনা- শাহী মো: মেহরাব আলম/অষ্টম শ্রেণি; বাবা ও মা- শাহী মোঃ তানভীর আলম, অর্থনীতি '০১ ও পিয়া
2. Interrelationship between German and English language – দেবত্রী মল্লিক (নিতুই); বাবা ও মা- বিশ্বজিৎ মল্লিক (শুভ), নগ্রাপ'৯৪; দীপিকা
3. বলতে না পারা কথা - মোঃ খুরশীদ হাসান সজীব, নগ্রাপ'৯৯
5. হাঙ্গেরিতে প্রথম দিন - এম এম আব্দুল্লাহ আল মামুন সনি, সমাজবিজ্ঞান'১৪
6. সময় – মফিজুর রহমান, পরিবেশবিজ্ঞান'০০
7. বন্ধু - তৌহিদ আমানুল্লাহ, স্থাপত্য'৯১ (খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সন্তান)
8. সখী, ভালবাসা কারে কয়? - অতল সাহা, এফএমআরটি'০৩
9. The Streets and Architecture of Bucharest: A Photo Diary of Perfect Mixture – সৌরভ পল, স্থাপত্য'১১
10. এইটুকু ফাঁক থাকা ভালো - মিঠুন কুমার সমাদ্দার, এটি'০৫
11. জার্মানিতে বরিশালের ঐতিহ্যবাহী পানীয় "মলিদা" - জামিল শুভ, বিজিই'১৪
12. তুই আমার আরেক মেয়ে - Dr Nazmul Siddique, (খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক)
13. শহুরে সবুজ বাসে জীবনের প্রতিচ্ছবি - প্রেক্ষাপট ইউরোপের দিনকাল - সৌরভ দাস, সমাজবিজ্ঞান'০৬
14. কানাইনগর - বিশ্বজিৎ মল্লিক (শুভ), নগ্রাপ'৯৪
15. স্বপ্নভঙ্গের টুকরো স্মৃতি – সৈয়দ মোর্শেদ কামাল, বিবিএ'৯৪
16. মানুষ - তৌহিদ আমানুল্লাহ, স্থাপত্য'৯১ (খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সন্তান)
17. Covid-19 ব্যবস্থাপনা, ভাবতে হবে নতুন করে - মহিউদ্দিন গাজী, বিজিই'৯৭
18. এক সুপ্ত লালিত স্বপ্নের পথ চলা শুরু - শাহী তানভীর, অর্থনীতি '০১
19. KUinEu reunion 2021 - জামিল শুভ এবং তাসমিনা তাবাচ্ছুম, বিজিই'১৪
20. মীরসাব; বাবা ও মা- গাজী মহিউদ্দিন, বিজিই'৯৭; মিফ্তাউল জান্নাত
21. মাহিবা; বাবা ও মা- গাজী মহিউদ্দিন, বিজিই'৯৭; মিফ্তাউল জান্নাত
22. বাবুই; বাবা ও মা- বিশ্বজিৎ মল্লিক (শুভ), নগ্রাপ'৯৪; দীপিকা
23. মিশরাক; বাবা ও মা- গাজী মহিউদ্দিন, বিজিই'৯৭; মিফ্তাউল জান্নাত
24. স্মারক রায়; বাবা ও মা- জীবন রায়, ইসিই'০১; সেঁজুতি রায়
25. নিসা; বাবা ও মা- শাহী তানভীর, অর্থনীতি '০১ ও পিয়া
26. তাজরিন নুমাহ; বাবা ও মা- তৌহিদ আমানুল্লাহ, স্থাপত্য'৯১; সামিনা শালেহ, স্থাপত্য'৯২
27. রায়দুর রাহমান; বাবা ও মা- আতিকুর রহমান রানা, নগ্রাপ'৯৩ ও মিনহার বেগম

শেকড়ের টানে

For the Roots

KUinEu

Khulna University Graduate in Europe

মতামত ও লেখা পাঠানোর ঠিকানা
newsletter@kuin.eu

www.kuin.eu